কাগ
নয়
লীলা মজুমদার

কাগ নয়

কাগ নয়

লীলা মজুমদার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

আমার মেজদির মেয়ে
রুবি ও নিনিকে
অনেক ভালোবাসার সঙ্গে
এই বই দিলাম

সূচীপত্র

কাগ নয়

নাঃ! ওরা কাগ হতেই পারে না। কাগের অমন চোখ হয় না! বুদো ভাল করে জানলার হুড়কো ধরে, ভাঙ্গা গরাদের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে, দেয়ালে লটকানো শুঁয়োপোকার মতন করে ঝুঁকে দেখল। পষ্ট বোঝা গেল ওরা জ্ঞানী লোক, বহুকালের অভিজ্ঞ। ওদের মুখ দেখলেই বোঝা যায় এম্-এ পাশ না হোক্, শিক্ষিত জীব। সেই যে অতি-বৃদ্ধ মহাকাক, যে বুড়ো বটগাছে থাকত, তারই কেউ হবে, কাজিন-টাজিন।

বুদো নাক টেনে, গালের মধ্যে জিভ পুরে পানের টুপ্‌লির মতন বানিয়ে, হিসেব করে দেখল ওরা যেখানে বসে আছে সেটা ওর নাগালের মধ্যে; একটা তিন বাঁকা ডালের ফাঁকে, পায়ের কাছে নোংরা মতন বাসা ধরনের কী, আনাড়ি ভাবে কতকগুলো কাঠি দিয়ে সাজান মনে হল। আর তার মধ্যে, ওমা, একটা আশ্চর্য নীল ডিম! হাত বাড়ালেই নেওয়া যায়!
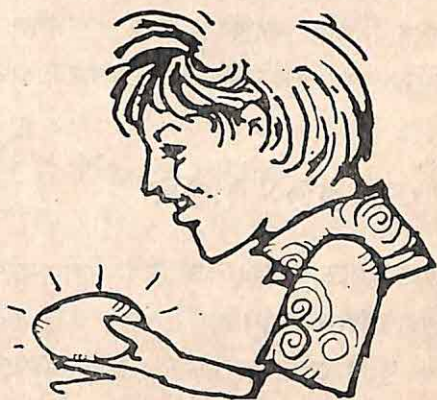
সেবার জ্বরের সময়ে ডাক্তারবাবু যেখানে আঙুল রেখে ঘড়ির

দিকে তাকিয়ে বোধ হয় কি সব অঙ্ক কষছিলেন, বুদোর হাতের সেখানটায় কী রকম করতে লাগল! বুদো হাত বাড়াল। হঠাৎ চোখ পড়ে গেল যারা কাগ নয় তাদের ওপর। তাদের লাল্‌চে চোখ খালি খালি খুলছে আর বুঁজছে। বুদোর বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করতে লাগল, তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিয়ে, জানলাটা দুড়ুম্‌ করে বন্ধ করে দিল। কড়াটা ছেড়ে দেবামাত্র জানলা গেল আবার খুলে। বুদো দেখল তারা সেখানে নেই, আছে শুধু সেই আশ্চর্য নীল ডিম।

টুপ্‌ করে সেটি তুলে নিয়ে এক ছুট্‌—বারান্দা দিয়ে, দিদিমার ঘরের সামনে দিয়ে, একেবারে সিঁড়ির কোণায় সেই অন্ধকার জায়গাটায়, যার কথা কেউ জানে না। শুধু নেড়ু জানে, কিন্তু সে ত' কবে মামাবাড়ী চলে গেছে, চিঠিও লেখে নাই।

সেইখানে আধছায়ায় আশ্চর্য নীল ডিমটা একবার ভালো করে দেখে নিল। অন্ধকারে মনে হল নীল ডিমের গায়ে নীল পেন্‌সিল দিয়ে লেখা,—এ্যাঁকা ব্যাঁকা অক্ষরে, বানান ভুল করে,—

উমে.র টেক্স টেল্.টেজ [illegible]

চোখ রগড়ে ভালো করে দেখল লেখা-টেখা কিচ্ছু নেই, ডিমের গায়ে শিরা শিরা আঁকা।

বুদো সেটাকে একটা ছোট কাগজের বাক্সে তুলো দিয়ে রাখল, যেমন দাদা রাখে। বাক্সটা পকেটে করে, জল খাবার খেয়ে, খেলতে গেল ; ডিমের কথা আর মনেই হল না।

রাত্রিবেলা শোবার সময়ে ঘরের কোণায় টিম্‌টিমে লণ্ঠন জ্বলছে ; বুদো একলা একলা কোট খুলছে, টপ্‌ করে বাক্স পড়ল মাটিতে।

চমকে গিয়ে বুদো জিভ কামড়ে ফেলল! বাক্স খুলে দেখল—শক্ত ডিম, ভাঙ্গে নি।

সেটাকে বালিশের নীচে রেখে, বুদো জুতো খুলছে আর খালি মনে হচ্ছে ঘরের কোণায় ও দুটো ত' ছাতা নয়, সেই যারা কাগ নয় তারা, ডিমের খোঁজে এসেছে।

বুদো নাকমুখ ঢেকে চুপটি করে শু'ল। কিন্তু তবু কারা যেন আলমারীর ঘুপ্‌সি কোণে, খাটের তলায়, চটির পাশে, দরজার আড়ালে লণ্ঠনের ছায়ায় কেবল ডিম খুঁজে বেড়াতে লাগল!

বুদো অন্য কথা ভাবতে চেষ্টা করল। মনে হল সেই আফ্রিকায় কোন্ মরুভূমির মাঝখানে ভ্রমণকারীরা আশ্চর্য ডিম পেয়েছিল, থলেয় করে আনতে গিয়ে একটা গেল ফুটে, তার ভেতর থেকে বেরুল কী একটা অদ্ভুত অতিকায় জন্তুর খুদে ছানা! ভয় পেয়ে অন্যটা বুঝি তারা অম্‌লেট্ করে খেয়ে ফেলল!

আবার মনে হল সেই কোথাকার রাজাকে সন্ন্যাসীঠাকুর ছোট্ট পাখী দিয়েছিল, সেই পাখী রাজার বাগানে ফল খায়, আর বড় হয়, তারপর কি জানি একটা ভীষণ কাণ্ড হল, ভুলে গেছি।

আরও মনে পড়ল সেবার নাকি দেশ থেকে মেজকাকা আসছিলেন বিস্কুটের টিনে ষাটটা ডিম নিয়ে। যায়গা না পেয়ে বিস্কুটের টিনের ওপর বসেছিলেন, হঠাৎ শোনেন "কঁ-ক্, কঁ-ক্, কঁ-ক্"! খুলে দেখেন তা' লেগে সব ডিম ফুটে গেছে!

বুদো শুনতে পেল খাটের তলায় কি যেন সরসর করতে লাগল; ঝুঁকে দেখবার যোটি নেই, যদি নাক টেনে ধরে! আর বালিশের নীচে কি যেন খচমচ করে উঠল,—যারা কাগ নয় তাদের ছানা সাড়া দিচ্ছে না ত'!

দেখল, ঘরের কোণায় যেগুলো ছাতা মনে হয় কিন্তু ছাতা নয়, সেগুলো নড়ে উঠে, ডানা মেলে, খাটের রেলিংএ বসল। লাল্‌চে চোখ গোল গোল করে বলল—"ডিম নিয়েচ ? হাফ্ বয়েল্ খাবে ?" বুদো ভাবল "কাগের ডিম ত' খায় না।" —কিন্তু ওরা যে কাগ নয়। তাই বুদো ডাকল, "মাঁ—আঁ !"

মাও এলেন, ডিমও নিয়ে গেলেন ফেরৎ দিতে, কিন্তু বুড়োরা অমন যখন-তখন এলে আমি আর গল্প বলব না।

আষাঢ়ে গল্প

আষাঢ় মাসের প্রথম দিন শুরু হল গল্প। বর্ষা এই এল বলে গরম তো নয় অল্প। গাঁ সুদ্ধু সকলের মেজাজ বিগ্‌ড়ে আছে, কথায় কথায় রাগ।

সন্ধ্যেবেলায় বড়ডাঙার মাঠে, কাঁচা এক বেল ঠেঙিয়ে ফুটবল খেলার পরে, বগাই, দামু, টপ্পা, ভোঁদা, মাইকেল, নেপু, নাদ্দু, করকরি, কেষ্টা, জনি, আলি ইত্যাদি দশ-বারোজন ঝগড়া করছিল। এমন সময় গয়লানী-মাসি এসে কেঁদে পড়ল,

"ওরে বগা দামু টপ্পা ভোঁদা বল্ দিকিনি
কেলে ধলা পাট্‌কিলে সোনা পুষি মিনি,
ছ-জনার একটিকেও দেখতে কেন পাচ্ছিনি ?
খাবি দাবি ল্যাজ নাচাবি কাজের বেলা কাঁচকলা,
এই কথাটা নরম করে একবারটি যেমনি বলা—

শুনেই সবাই খাট থেকে,
মোড়া থেকে, সাফ কাপড়ের
ঝোড়া থেকে, খেয়েদেয়ে
যে যেখানে শুয়েছিল, অমনি
হঠাৎ সেখান থেকে সটাং
দিল, এমনি লক্ষ্মীছাড়া!
আমি হেথা উপবাসী, হেঁপো
কাশি, সারাদিন বিরাম-
বিহীন খুঁজে খুঁজে সারা।
একবারটি যা দিকিনি, খুঁজে-
পেতে ধরে নিয়ে আয়, নইলে আমার পেরাণ যায়।
লেবু চিনি মাঠা দিয়ে দেব খেতে মস্তপানা ঘটি ভরে,
মানিক ওরে, সন্ধ্যেবেলায়, যে জায়গাতে যেতে নেই, ভালো করে
সে-সব জায়গা আয় তো দেখে, বাবাজীবন!
সোনামানিক, চোখের মণি, বুকের ধন!
বেড়াল ছেড়ে কেমন করে বেঁচে থাকি বল্ এখন!"
মাসি থেমে হাঁপাতে লাগল। তারপর আবার বলল, "বল্ আমারে,
বেড়াল ছেড়ে, দুঃখী কভু থাকতে পারে?"

ব্যস্, ওদের ঝগড়া থেমে গেল, যেন আগুনে কে জল ঢালল। নেপো বলল, "দেবে তো ঠিক বল মাসি কিন্তু তুমি দুঃখী শুনে পাচ্ছে হাসি। আমরা আছি বারোজনা তায় নাদু একটু বেশি করেই খায়। মাসি জিব্ কেটে বলল,

"দোব, দোব, দোব। এবার ওঠ্ দিকিনি, খুঁজতে বেরো।
সন্ধ্যে লাগলেই খায় যে ওরা, বল্ তো বাবা, এ কি গেরো!

মাঠা তো দেবই তোদের, আখের গুড় দিয়ে ছানা মেখে দেব, বাছারা আমার ছানা মুখে দেয় না।"

আর দেখতে হল না। যে যেখান থেকে পারল লাঠি-সোঁটা, গোটা গোটা গাছের ডাল চেঁচেছুলে, কাঁধে তুলে রওনা দিল। তাই দেখে মাসির এদিকে চক্ষু স্থির! ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল,

"মারিস্‌নে বাপ, লাগবে ওদের। বলছি তোদের, বড্ড নরম গা। কাজ করে তো অভ্যেস নেই, আত্বরে শরীল। বুঝিয়ে স্থুঝিয়ে তাড়িয়ে আনিস্। যাই তোদের মাঠায় লেবু গুলি গিয়ে।"

আর কি ওরা থাকে সে বাটে। সোজা গেল মাছ-ধরুনির ঘাটে। যেখানে জেলেরা ডিঙি উপুড় করে, সেখানকার মাটি শ্যাল কুকুরে চাটে। সেইখানেই মাসির বেড়াল পাওয়া যাবে। রোজ রোজ ক্ষীর মাখন দুধ সর খেয়ে খেয়ে সব এমনি ফুলেছে যে কেউ গাছে চড়তে পারে না। তাই বেল-তলায় কি শ্যাওড়া-বনে খুঁজে লাভ নেই! দূরও অনেক।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই! ঘাটের কিনারায় ক'টি আঁশ পড়ে ছিল। সাদা, কালো, ছাই, হলুদ, ছোপ-ধরা আর ডোরা-কাটা ছটি মোটা মোটা বেড়াল তাই শুঁকে হন্যে হচ্ছিল। সূর্য ডোবার সঙ্গে তাদের পাথর-বাটিতে ক্ষীর মোয়া খেয়ে অভ্যেস।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম উপর নিচ এ-পাশ ও-পাশ, এই বারো দিক থেকে লাঠি-সোঁটা নিয়ে যখন বারোজন রে-রে-রে-রে করে ছুটে এল, তখন তারা পালাবার পথ পায় না। খালি এক জায়গায় ইচ্ছে করে একটু ফাঁক রাখা হয়েছিল ; বুদ্ধি তো নয় কম। নেপুর আর নাদ্দুর মধ্যিখানের সেই ফাঁকটি দিয়ে সাঁই-সাঁই করে ছয় বিল্লি হাওয়া!

মিয়াও-মিয়াও করে দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে তারা

এক্কেবারে গাঁয়ের মধ্যিখানে পৌঁছে গেল। আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ-ঝাড়, নালা-নর্দমা, খানা-খন্দ, আস্তাকুঁড় আর ছাই-গাদা থেকে, দলে দলে পাঁশ-কুড়ুনি, উনুনমুখো, হাঁড়ি-খেকোরা যে যেখানে ছিল, নিজেদের মধ্যেকার বারোমেসে ঝগড়াঝাটি ভুলে,

সরু-মোটা, লম্বা-বেঁড়ে, ঝাঁকড়া-ন্যাড়া ল্যাজ না তুলে,
নানান্ সুরে নানান্ স্বরে গলা ছেড়ে,
হৈ হৈ হুদ্দাড় হাঁচড়-পাঁচড় এল তেড়ে।

এক দিকে—"খেউ খেউ খেউ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্
ও দাদা! এবার মজা ছ্যাখ্ ছ্যাখ্ ছ্যাখ্!"

আর অন্য দিকে—"মিঁ-য়া-ও ফ্যাশ্—ফোঁশ্!
এলাম বলে। একটু রোস্!
খচর-খাচর, মারব আঁচড়,
ফেলব ছিঁড়ে আমি আগে!
—ই-কি দাদা, কোথায় ভাগে?"

তখন গয়লানী-মাসির ছয়টা আহ্লাদে বেড়াল, যারা কাজকম্ম করে না, শুধু খায় আর ঘুমোয়, আলো পড়লেই যাদের চোখের কপাট বন্ধ হয়, নখ যাদের লুকিয়ে থাকে আর মোটা শরীর নিয়ে যারা গাছে চড়তে পারে না, প্রাণের ভয়ে সেই ছয়টা আদুরে বেড়াল, বিদ্যুতের হল্কার মতো শ্-শ্-শ্যা-ৎ করে গাঁয়ের মোড়লের ন্যাড়া চাঁচাছোলা তালগাছের এক্কেবারে মগ্ডালের তালের গোছার ওপর উঠে বসল।

তারপর আর নামতে পারে না! এরা বারোজন মাঠা আর ছানা-মাখা ফস্কে যাবার ভয়ে, কত ডাকল, কত বোঝাল, কত ভয় দেখাল, কত ফুস্লাল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

শেষে যখন বগাই আর দামু কোমরে কাছি বেঁধে গাছে চড়বার তোড়জোড় করছে, তখন হল্লা শুনে উঠি-পড়ি করে, শুঁটকি-মাছের হাঁড়ি হাতে, গয়লানী-মাসি ছুটে এসে সুর করে বলতে লাগল,

"ও আবাগী! মচ্ছি খাগী!
কি এনেছি তোদের লাগি!
শুঁটকি-মাছ খাবি যদি নেমে আয়!
এ সুগন্ধে আকাশ-পথে সোনার রথে
সূয্যি-মামা থেমে যায়!
নেমে আয়! আ—তু—তু—তু—তু—"

আর বেশি বলতে হল না। মাছের খোসবাই নাকে যেতেই ছয় বিল্লি ভয় ভুলে সর-সর করে নেমে এসে, একসঙ্গে গয়লানী-মাসির কোলে উঠবার জন্য হাঁকুপাঁকু করতে লাগল। মাসির একটু রাগ-ও হয়েছিল। ইদিকে কাজকম্মের নাম নেই, তা কিছু বলেছে কি না বলেছে, অমনি পিট্টান! ভোঁদা দেখল মাঠার আর ছানা-মাখার তাহলে বোধ হয় হয়ে গেল! সে মাসিকে বলল, "রাগ কিসের, মাসি? কাজ তো করে ওরা। ওরাই না ইঁদুর ভাগায়!—বলি মাঠা, ছানা পাব তো?"

মাসি এক গাল হেসে বলল, "পাবি, পাবি, সব ঠিক করে রেখে এসেছি। আয়, সোনামুখোরা, সবাই একসঙ্গে আমার কোলে আয়!"

তখন ছয়টা বেড়াল ছয় লাফে মাসির কোলে মাথায় ঘাড়ে চেপে—

পুরনো সেই মাছগন্ধী আরামপন্থী নিরাপত্তার আশায়, যা বলল সবাই খটমট দুর্বোধ্য এক বেড়ালীয় ভাষায়,—তার সোজা বাংলা করলে দাঁড়ায়—

মিয়াও—ম্যাও—মুম্!

তোমার খাটের মধ্যিখানের যে জায়গাটা সবার থেকে নরম, তোমার গায়ের ছোঁয়াচ লেগে চ্যাপ্টা এবং গরম,—ভালোবাসার চোটে মোদের নেই কো লজ্জা শরম!

মুম্!
সেইখানেতে দেব মোরা নিরাপদে ঘুম!
বিদ্ঘুটে কুত্তো এলে বল দূর দূর!
তবু যদি না যায় তবে মারিও লগুড়!
আমরা ছ-জনা তোমারি ক-জনা,
অন্যায় যদি করে থাকি অ মা,
শুঁট্কি মাছে ভাত মেখে, করিও ক্ষমা!
মুম্।
দাও চুম্!

মুনি

যা-তা বলত ভুনিয়া। ও আমাদের ভারি ঘেন্না করত। বলত, "ছাই লেখা-পড়া শেখ। হাওয়া দেখে বিষ্টি বলতে পার? জান, যে-দিক থেকে ঝড় আসবে বাবুই-পাখিরা তার উল্টো দিকে মুখ করে বাসা বানায়? আমাদের মোড়ল বলে তোমরা কিছু ছুঁলে সেটা পাপ হয়ে যায়।" তাই শুনে বুটি-দিদি বলত, "তাহলে আমাদের বাড়িতে মাছ-ভাত খাও কেন?"

ফিক্ করে হেসে ভুনিয়া বলত, "খিদে পায় তাই খাই। তাছাড়া কে আমাকে রোজ রোজ মাছ-ভাত দিচ্ছে বল? কাকার ছেলেরা বিচিসুদ্ধু কুল ছেঁচে তাই খায়, গাব খায়, মহুয়া খায়—রান্না জিনিস কোথায় পাবে? বাঁকিপালুতে গাঁয়ের লোকরা বনদেওদের পূজো দেবে শুক্কুরবার, দেখতে যাবেনি?"

আমার মন খারাপ ছিল। বললাম, "গিয়ে কি হবে? তোমাদের দেওতা নিশ্চয় গাছ আর পাথর। তার সামনে মোরগ বলি দিয়ে তোমরা রেঁধে খাবে।" ভুনিয়া ভারি অবাক হল, "বনদেওরা গাছ পাথর হবেন কেন? গাছ পাথরে থাকলেই কি গাছ পাথর হয়ে যায়? তোমরা ইঁটের বাড়িতে থাক বলে তোমরাও কি ইঁট! বনদেওতা হলেন গিয়ে পিরথিমি, চাঁদ, সূয্যি, ঝড়, বাজ, এই সব। তা শুক্কুরবার সূয্যি উত্তুরে পা দেবেন, পূজো দেব না?"

আমি চুপ করে রইলাম, যদিও বুঝলাম ভুনিয়ার খুব যাবার ইচ্ছে। ভুনিয়া বলল, "পাখি পাইয়ে দেন।" ভারি বিরক্ত লাগল, "দেবে তো কতকগুলো সাদা মোরগ বলি, তাপ্পর সেগুলো খেয়ে-ও ফেলবে। পাখি পাইয়ে দেবেন আবার কি?"

ভুনিয়া বলল, "হিঞ্চে থাকলে সব করিয়ে দেন। নইলে বিদেশীরা আসে কেন? হাজার হাজার পঞ্ছি ছাড়া হয়।"

ওর কথা শুনে সবাই হাঁ। পঞ্ছি ছাড়া হয় আবার কি? ভুনিয়া

আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বলল, "সব্বাই যাবে পাখি নিয়ে। খাঁচায় পুরে, দাঁড়ে বসিয়ে, ঠ্যাং-এ দড়ি বেঁধে, হাজার হাজার পাখি নিয়ে সব যাবে। বাবা, কাকা, বুড়ো-ঠাকুর সক্কলে গাঁ খালি করে যাবে। পাহাড়ের মাথায় যে বটগাছটি, সেখানে বনদেও থাকেন। তাঁকে মোরগ দেয় আমাদের গাঁয়ের লোকরা। তারপর পাখি ছাড়া হয়। যার যা মনের হিচ্ছে, মনে মনে তাই বলে একেকবারে পাঁচটা দশটা করে পাখি ছাড়ে লোকে আর সব হিচ্ছে পুরে যায়।"

বুটি-দিদি বলল, "পরীক্ষা পাস্ করিয়ে দেয় বনদেও? সে কি লেখা-পড়া জানে?"

ভুনিয়া বলল, "ওমা! তা জানবে না? পূন্নিমের চাঁদ আঁধার করে দিতে পারল আর এটুক্ পারবে না! নিজের চোখে দেখলাম সাদা চাঁদের মধ্যিখানটি গাঢ় নীল হল, তার চারদিকে ঘোর লাল রঙ লাগল। তাছাড়া বনদেও পাস্ করাবে কেন, বই পড়লেই তো পাস্ হয়, মাস্টারদিদিকে বলতে শুনেছি।"

বদনদা বলল, "পাখি যে ছাড়ব, তা পাব কোথায়?"

ভুনিয়ার কি উৎসাহ! "চলই না, আধ কোশ দূর থেকে কিচিরমিচির শোনা যায়। ওখানে লাখ লাখ লোক পাখি বেচতে আসে। কুড়ি পয়সা করে একেকটার দাম। বাবারা তো এত পয়সা কামায় যে ছাগলী কেনে।"

বুটি-দিদি আর বদনদার কি উৎসাহ। "চল, দেখেই আসা যাক। বন্দী পাখি ছেড়ে দেওয়া তো ভালো কাজ। তার ওপর যদি—যাবি নাকি বকু? তাহলে ভুনিয়াও যাবার অনুমতি পাবে। রাস্তা তো চিনি না।" আমি একটু ইয়ে কি না, তাই ভুনিয়ার কাজ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকা। ভুনিয়া আমাকে সাহস দিয়ে বলল, "চলই না, বকু-দাদা,

হয়তো পাখি পাইয়ে দেবেন। সকালে যেন সবুজ পায়রা দেখেও এলাম।”

আমি লাফিয়ে উঠলাম, “সত্যি দেখেছ, ভুনিয়া? তার পায়ে তামার ঘুন্টি পরানো ছিল? মুনিকেই দেখেছ?”

ভুনিয়া বলল, “অত দেখা যায় নাকি হাজার হাজার পাখির মধ্যে। সবুজ পায়রা তো আর একটা ছিল না!”

আর দেখতে হল না। চার দিন হল আমার সবুজ পায়রা মুনি পালিয়েছে। ওখানে গেলেই হয়তো পাব। বনদেও-ই হয়তো পাইয়ে দেবেন। বড়দের রাজী করিয়ে, পকেটে যে যা পারল পয়সা নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা রওনা হয়ে গেলাম।

সে কি জায়গা! টিলার ওপর লোকে লোকারণ্য; চারদিকে কিচিরমিচির, কেমন একটা গরম গরম গন্ধ। তা হবে না? পাখির গা বেজায় গরম হয়। মুনির ডানার বগলে বোধ হয় ডিম ভাজা যায়। বটতলায় গেলাম না। মোরগ বলি দেখলে বুটি-দিদির নাকি গা-বমি করে। সাদা মোরগ মারলে আমারো খুব কষ্ট হয়; কালো মোরগ আনলেই পারে।

একটু দাঁড়াবার জায়গা নেই; তারি মধ্যে ভুনিয়া আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। পাখি বেচছে গাঁয়ের লোকে, কিনছে শহরের লোকেরা। পাখির গায়ে তারা হাত-ও দিচ্ছে না। পাখিওয়ালাদের সামনে পয়সা ফেলে কোন পাখি পছন্দ দেখিয়ে দিলেই হল। পাখি-ওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে তাদের পায়ের বাঁধন কেটে দিচ্ছে, খাঁচার দোর খুলে দিচ্ছে। পাখিগুলো প্রথমটা যেন হকচকিয়ে যাচ্ছে, চোখ পিটপিট করে দু-চার পা হেঁটে, জোরে ক'বার ডানা ঝাপটে, শাঁ করে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। সব উড়ে যাচ্ছে উত্তর দিকে। একজন পাখি-

ওয়ালা বলল, "তা যাবে না, কাল থেকে যে বড়-বোঙাও উত্তুরে পা দেবেন।"

দেখছি আর দম বন্ধ হয়ে আসছে। এক বুড়ি একশো শালিক ছাড়ল। তার ছেলে কাজকর্ম করে না, খালি বসে বসে খায়। পাখি ছাড়লে, বনদেও নাকি তার হাতে জোর করে কোদাল-কুড়ুল ধরিয়ে দেবেন। আরেকজন গরীব মানুষ পাঁচটা কালো বুলবুলি ছাড়ল; গত বছরও পাঁচটা পাখি ছেড়েছিল, তাতেই ছেলের অসুখ সেরে গেছে, এবার তাই খুসি হয়ে আরো পাঁচটা ছাড়ল। সব পাখি উত্তর দিকে উড়ে গেল।

হঠাৎ ভুনিয়া বলল, "উই যে আমার বাবা, কাকারা। উনাদের কাছে ভালো পাখি আছে।" বুটি-দিদি দু' টাকা দিয়ে কুড়িটা পাখি কিনে, নিজের হাতে তাদের পায়ের দড়ি খুলে দিল। মনে হল সবগুলো ছাতারে। তারা চোখ পিটপিট করে দু' পা হেঁটে, অমনি উড়ে চলে গেল। বদনদার অত পয়সা ছিল না, তবু সেও দশটা পাখি ছাড়ল। তখন ভুনিয়া আমার দিকে ফিরে বলল, "কই, বকুদাদা, তোমার পয়সা বের কর। সবুজ পায়রা কিনবে না?"

আমি মাথা নাড়লাম। পয়সাগুলো বড়কাকার কাছে রেখে-ছিলাম। আসবার সময় চাইতে গেলাম, তা কিছুতেই দিলেন না। শুধু একটা দশ পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "যা ভাগ্, পয়সা ওড়াতে ওস্তাদ!"

আমার মুখের দিকে চেয়ে ভুনিয়া বলল, "কাকাবাবু পয়সা দেয়নি বুঝি? কত আছে?" আমি দশ পয়সা বের করে দিতেই, ভুনিয়ার বাবা হেসে বলল, "ঐ তো, ওতেই হয়ে যাবে। একটা পাখির দাম দশ পয়সা। দেখ তো এইটে পয়সান্দ হয় কি না।" এই বলে ঝুড়ির

তলা থেকে পায়ে তামার ঘুন্টি পরানো একটা সবুজ পায়রা বের করে দিল। সে যে আমার মুনি তা আর কাউকে বলে দিতে হল না। আমি দু' হাত দিয়ে মুনিকে ধরলাম। মুনি আমার গালে ঠোঁট দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে দিতে লাগল। বাঃ, সত্যিই তো বনদেও আমার পাখি পাইয়ে দিয়েছেন। বেজায় খুসি হয়ে দু' হাত মাথার ওপর তুলে মুনিকে ছেড়ে দিলাম। মুনি শূন্যে এক পাক খেয়ে শাঁ করে আকাশে মিলিয়ে গেল।

বুটি-দিদি, বদনদা, ভুনিয়া অবাক হয়ে বলল, "ও কি হল? পাখি হারিয়েছে বলে চারদিন নাওয়া-খাওয়া বন্ধ! আর পাখি পেয়েও ছেড়ে দিলি? তুই একটা গাধা!"

আমি আর সেখানে এক মিনিটও থাকলাম না। উঠি-পড়ি করে দৌড়ে টিলার ওপর থেকে নেমে বাড়ির দিকে দৌড়লাম। মা, বড়-কাকী, ঠামু সব "কি হল, কি হল," করে বেরিয়ে এলেন। আমি সটাং আমার ঘরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম।

অনেক পরে বুটি-দিদিরা ফিরল শুনলাম। ওরা বোধ হয় অন্যদের কাছে সব কথা বলল। আরো পরে ঠামু আমাকে খেতে ডাকতে এসে অবাক্! "ও মা এ কি! মুনি কখন ফিরে এসে ওর বাক্সের ওপর বসে আছে যে? চল্, লুচি আলুর দম করেছি।"

আমি উঠে বসে 'মুনি' বলে ডাকতেই মুনি আমার কাঁধে বসে কানে ঠুকরে দিল। ও কোথাও যেতে চায় না।

ঠামু বলল, "এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার!"

বড়কাকী বললেন, "আশ্চর্য আবার কি, মা? সব ঐ পাখি-ওয়ালাদের শেখানো পাখি। পয়সা দিয়ে বিক্রি করে। কিন্তু ছেড়ে দিলেই সোজা উত্তর দিকে পাখিওয়ালাদের বাড়িতেই ফিরে যায়!

এ-পাখিও তো পাখিওয়ালার ছেলে ভুলিয়া দিয়েছিল।"

ঠামু বলল, "দূর, তা দিতে পারে, কিন্তু এ পাখিকে তো বকু পেলেছে। তাই ছাড়া পেয়ে আবার এখানেই ফিরে এসেছে। না হয় ওকেও নিয়েই চল্ রে, বকু, মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ খায়নি।"

মুনি বলল, "বক্-বকম্-বক্! বকম্-বক্-বকম্!"

তানির ডাইরি

এই যে বড় বনটা দেখছ, এতে হাজার হাজার গাছ আছে। শাল, সেগুন, আম, কাঁঠাল। কি ভালো ভালো সব গাছ। তার কাঠ দিয়ে কত কি জিনিস তৈরি হয়। জাহাজে করে বিলেতে যায় এ-সব কাঠ, তা জান? যে-সে গাছ কাটতে পারে না, দপ্তরখানা থেকে টাকা জমা দিয়ে শীল-মোহর করা চিঠি আনতে হয়। জান, আগে আমার বাবা এই বনের চৌকিদার ছিল; চক্চকে পেতলের তক্মা আছে বাবার। বাবার নাম ফাগুলাল। দপ্তরের ছোট সায়েব যেই ডাকত ফেগো-ও-ও! বাবা ছুটতে ছুটতে যেত। বাবা না গেলে কোনো কাজ-ই হত না। এখনো হয় না। ভয়ঙ্কর ভালো আমার বাবা।

এই বনটার নাম ভীম্নি। সেকালে এই বনে বাঘ থিক-থিক করত। একা কেউ বেরোত না। সন্ধ্যের আগে সবাই বাড়ি ফিরে ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকত। আমার প্রাণের বন্ধু শিবুর দাদু বলে, বাঘরা সব নাকি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াত। মানুষের মতো গলা করে

একবার দাদুকে রাত দুপুরে ডেকেছিল—"ও ছোক্‌না বাড়ি আছ? আতান্তরে পড়েছি। দোর খোল।" দাদু হয়তো খুলেই দিত, বিপদে পড়ে কেউ এলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হয় না। তা বুড়ি-দিদি—সে হল দাদুর মা—সে দাদুকে কোলপাঁজা করে ধরে রাখল, কিছুতেই দরজা খুলতে দিল না। বাতার ফাঁক দিয়ে দাদু দেখেছিল ঐ গাছতলা দিয়ে চাঁদের আলোয় এই বড় বাঘ দাপিয়ে দাপিয়ে চলে যাচ্ছে! শিবু বলে দাদু বানিয়ে গল্প বলে।
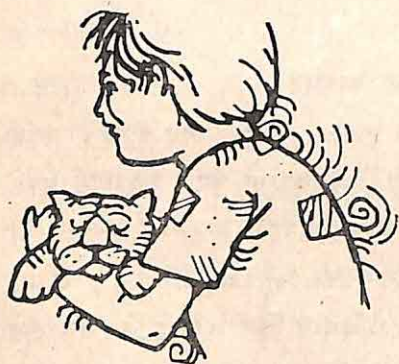
এখন ভীম্‌নির বনে একটাও বাঘ নেই। শিকারীরা মেরে মেরে শেষ করেছে। অথচ এটা বাঘ থাকার জায়গা; এই রকম জল হাওয়া মাটিতে বাঘরা ভালো থাকে। তাই এখানে বাঘের চাষ হবে। একজন লাল-মুখো সায়েব আর একজন বাঘ-বাবু এসে সব দেখেশুনে গেছে। বনের চারদিকে ঘেরাও দেওয়া হবে। যাতে বাঘরা পালাতে না পারে আর দুষ্টু লোকরা আবার বাঘ মেরে শেষ করতে না পারে। জান, আমার বাবা বাঘ-জেমাদার হবে, বাঘ যাতে গুন্‌তিতে কম না হয়, তাই দেখবে।

আমার মার কি ভয়! "হ্যাঁ গো, বাঘ যে গুণবে, বাঘ যদি কামড়ে দেয়?" মেয়েরা বড় ভীতু হয়। বাবার একটুও ভয় নেই। বাবা বলল, "এই যে বন দেখছ, এতে এত গাছ কি করে হল জান? একটা গাছ কাটার এক বছর আগে ঠিক ঐ জাতের তিনটে গাছ পুঁতে দিতে হয়।

দুটো হয়তো মরে যায়, একটা বাঁচে। বড় গাছটা কেটে ফেললে, সেই গাছ তার জায়গা নেয়। তোমারো দুটো ছেলে আছে। তানিটা বড় কিন্তু ন্যাংড়া, তাকে দিয়ে কিছু হবে না। কিন্তু পুন্নুর কি তাগৎ দেখেছ ? পুন্নু আমার জায়গা নেবে”—

আর শুনিনি আমি। ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে গভীর বনে চলে গেছিলাম। আমার নাম তানি। আমার ডান পায়ের সব আঙুল তলার দিকে দুম্‌ড়ানো। আমি গোড়ালিতে ভর দিয়ে হাঁটি। সবাই আমাকে বলে ন্যাংড়া। পুন্নুও আমাকে ন্যাংড়া বলে, দাদা বলে না।

আমি পাঠশালে যাই না। দু' বছর আগে বাবা আমাকে নতুন সাদা পাজামা আর লাল ফতুয়া পরিয়ে ডাকঘরের পাশের পাঠশালে ভরতি করে দিয়েছিল। কাঠের সিলেট আর এক বাক্স চক্ কিনে দিয়েছিল। খড়িকে এরা বলে চক্। তা যেই আমি টিপিনের ছুটিতে বেরিয়ে এসেছি, অমনি সব ছেলেমেয়েগুলো আমাকে ঘিরে সুর করে বলতে লাগল, খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং! কার বাড়িতে গিয়েছিলি, কে ভেঙেছে ঠ্যাং!

সেই যে এক দৌড়ে পালিয়ে এলাম আর যাইনি। বাবা মারলেও যাইনি। মা আমার নতুন পাজামা ফতুয়া বাক্সে বন্ধ করে রাখল। সেগুলো পরে সিলেটটা নিয়ে এ-বছর পুন্নু পাঠশালে যায়। আমি ওতে ছবি আঁকতাম।

কি আঁকতাম জান ? পাখি উড়ছে, ঘোড়া ছুটছে, হরিণ লাফাচ্ছে, মাছ সাঁতার দিচ্ছে, ভালুক পালাচ্ছে, শিকারী তীর ছুঁড়ছে।—আমি এ-সব কিচ্ছু পারি না। আমি দৌড়তেও পারি না। তাই ওরা আমাকে খেলায় নেয় না। আমাদের ডেরায় কত খেলা হয় ; ফুটবল, দৌড়-ঝাঁপ, গোল্লা-ছুট, খো-খো—আমি খালি খুব ভালো মার্বেল

খেলতে পারি। আমার দিদা আমাকে ঠাট্টা করে বলে, "তানির আবার ভাবনা কিসের? কি ভালো কাঁথা-সেলাই করে, তক্‌লিতে সূতো কাটে, রান্না করে!" আমার গলা ব্যথা করে, আমি বনের মধ্যে পালিয়ে যাই।

ভীম্‌নির বনের মধ্যে আছে তরাই নদী। তার দু' ধারে দু' ফালি বালি, তারপর টিলার গায়ে নোনা-পাথর। জানোয়াররা সেখানে জল খেতে আসে। জল খাওয়া হলে নোনা-পাথরে চাটন দিয়ে বনে ফিরে যায়। নূন ছাড়া ওরা বাঁচে না। হরিণ আসে, শেয়াল আসে, বন-বেড়াল আসে, ভালুক আসে। সকালে তাদের পায়ের ছাপ দেখা যায়।

শিবুর দাদু বলে, "নোনা-পাথরের জন্যেই এখানে বাঘের চাষ হচ্ছে। তোর বাবার মাইনে বাড়ল।"

বাবার মাইনে বাড়লেই পুন্নুর জন্যে জুতো কেনা হয়। আমার পা জুতোয় ঢোকে না। ওরা ঠাট্টা করে আমাকে ফুটবল খেলতে ডেকেছিল। মাকুদা ওদের কাপ্তান, তার মস্ত বুট আছে। সে আমাকে বলল, তোকে জুতো কিনে দেয়নি তো কি হয়েছে, এই নে এই বুট পরে তুই-ও খেলতে পারবি।" যাইনি, বনে পালিয়েছিলাম।

বনে একটা সুন্দর জায়গা আছে। মধ্যিখানটা একটা গোল গভীর পুকুরের মতো, তার ধারে বালি, তার ধারে কালো পাথরের চাঁই, চারদিকে বড় বড় বাঁশ-গাছ। কালো পাথরের ওপর ছুঁচলো চক্‌মকি দিয়ে আমি ছবি এঁকেছি, চিল ছোঁ মারছে, হাতির পাল শুঁড় তুলে দৌড়চ্ছে, এই সব। যা আমি পারি না, সব আমার আঁকার জানোয়াররা পারে। পাহাড়ি ছাগল পাথর বেয়ে ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের চূড়োয় উঠে যাচ্ছে—আঁকি।

সেদিন দেখি আমার আঁকার জায়গায় মস্ত এক কালো বন-বেড়াল শুয়ে শুয়ে পাঁচটা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। আরেকটা বাচ্চা রোগা, রোঁয়া-ওঠা, তাকে সবাই ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। সবুজ চোখ দিয়ে মা তাই দেখছে, কিচ্ছু বলছে না। আমার বুকটা খুব জোরে ঢিপ্-ঢিপ্ করতে লাগল। বিচ্ছিরি দেখতে ছানাটা। ঠিক তাদের নিচেই নদীর সেই গোল গভীর জায়গাটা। সেখানে মাছ লাফায়। তারি জলে মা বেড়াল আর ছানা বেড়ালদের ছায়া পড়েছিল। রোগা ছানা বারবার মিউ মিউ করে ঠেলে-ঠুলে মা-র বুকের কাছে যেতে চেষ্টা করছিল আর বারবার ভাইরা তাকে ঠেলে দিচ্ছিল।

রেগে ছানাটা ফ্যাঁশ্ করে যেই না লাফ দিয়েছে, অমনি পাথরের কিনারা থেকে খসে টুপ্ করে জলে পড়েছে। আমি আজকাল সাঁতরাতে পারি। এইখানে এসে মাঝে মাঝে সাঁতরাই। কেউ জানে না।

জলে নেমে ছানা তুলে, আমার ফতুয়ার বুকে পূরে নিয়ে চলে এলাম। ধারালো নখ দিয়ে সে আমাকে আঁকড়ে ধরল। ওকে পলতে করে দুধ খাওয়াব। পুষব। জান, ও-ও একটু খুঁড়োয়।

রাতে সেই লাল-মুখো সায়েব আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে ডেকে কি বলল। আমার ওপর বাবার কি রাগ! "কালো চিতার ছানা নিয়েছিস্? মাচা থেকে সায়েব দেখেছে। রেখেছিস্ কোথায়?" ফতুয়ার ভেতর থেকে বের করে দিলাম।

সায়েবের সঙ্গে সেই কালো মুন্সী-বাবু ছিলেন। তিনি বললেন, "তোর সাহস দেখে সায়েব থ'! চিতার মুখ থেকে ছানা তুলে আনলি!"

আমি বললাম, "চিতা না, কালো বেড়াল। মস্ত বড়। ওকে

কেউ চায় না।”

মুন্‌সী বললেন, “সায়েব বলছেন তুমি ওকে চাও? তাহলে পুষতে পার। কে ওর যত্ন করবে!”

আমি ভূষোকে আবার ফতুয়ায় গুঁজে রাখলাম। ওর নাম রেখেছি ভূষো।

সায়েব হঠাৎ আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আমার ডান পা-টা দেখল। তারপর আমার মাথা চাপড়ে দিয়ে গেল। রাতে বাবা বলল, “সদর হাসপাতালে গিয়ে তোর পা ঠিক করিয়ে আনব। মুন্‌সী-বাবু সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন।—এই! এই! বনে পালিও না, কালো চিতা ছাড়া আছে। বনের ওদিকটা ঘিরে দিলে, জানোয়াররা এদিকে আসতে পারবে না।”

তার পর এক বছর কেটে গেছে। আমি আজকাল দৌড়ই। ভূষো দৌড়য়। শিবুর দাদুর কাছে আমার লিখতে পড়তে শেখা হয়ে গেছে। সবাই অবাক। আমি স্কুলে যাই। বলিনি এ-বনটা বড় ভালো!

আনন্দ-জগৎ

আমার ছোটবেলাটা কেটেছিল শিলং পাহাড়ে। সে শহর তখন অন্য রকম ছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিরিবিলি, পাখির ডাক আর সরলবনের পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাস বইবার শোঁ-শোঁ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। সারা দিন বাড়ির পেছনের পাহাড়ি নদীর কুলকুল আর

তার পেছনে বনের মধ্যে কুকু-পাখির কু—কু ডাক। ষাট বছর আগে পাহাড় থেকে নেমে অবধি, একবার শিমলায় ছাড়া, ও ডাক আর শুনিনি।

ছোটবেলা শুনতাম আস্তাবলে রাখা আমার বাবার টাট্টু-ঘোড়া কালামানিক আর আস্তাবলের পাশে জালে-ঘেরা খাঁচার মধ্যে মুরগি ছাড়া আর কোনো জন্তু পুষতে নেই। কারণ তারা বড় নোংরা হয় এবং রোগের বীজাণু ছড়ায়। বলা বাহুল্য, রোজ সকালে ঘোড়ার সইস্ পন্নু কোদালে করে যে তাল-তাল ময়লা বের করে গর্তে ফেলত আর আমাদের উবিনের-মা যে-রকম গজগজ করত, "মুরগি বড় খারাপ জানোয়ার, ওর খাঁচা আমি সাফ করতে পারব না!" —তার থেকে ঘোড়া এবং মুরগির পরিষ্কারত্ব সম্বন্ধেও মনে যত সন্দেহ থাকত। কে যে খাঁচা সাফ করত এখন মনে করতে পারি না।
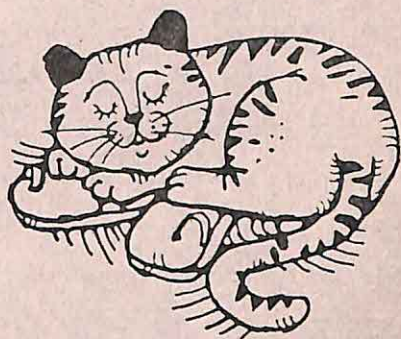
আমাদের বড়ই কুকুর, বেড়ালের শখ ছিল। তা হলে হবে কি! সে-কথা বলবারও সাহস ছিল না। দিদি একবার একটুকরো গাছের মরা শেকড় কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার গায়ে শ্যাওলা জন্মে দেখাত ঠিক যেন একটা বেড়াল ছানা গুড়ি মেরে আছে। সেটাকে পর্যন্ত ঘরে আনতে দিদি সাহস পেত না। যদি বড়রা বলেন—শ্যাওলায় রোগের বীজাণু থাকে, ফেলে দাও! তাই ওকে একটা গাছের কোটরে রাখা

হত। ওর নাম দেওয়া হয়েছিল কিটি।

এদিকে বাড়ির চারদিকে জীব-জন্তুর, বিশেষতঃ পোকা-মাকড় জাতীয় জন্তুর ছড়াছড়ি। ওখানে বসন্তকালে এমন সব রঙিন প্রজাপতি উড়তে দেখেছি, যাদের এক ডানার এ-মাথা থেকে অন্য ডানার ও-মাথা অবধি মাপে দেড় বিঘৎ। বাগানে দুটি গন্ধরাজ লেবুর গাছ ছিল, তাদের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সাজা পানের মতো বড় তিনকোণা সবুজ মাকড়সা জাল বুনত। মাকড়সার মাথা টকটকে লাল, বিকট দেখতে। আর কি শক্ত, চটচটে জাল! একবার একটা মস্ত প্রজাপতিকে জালে আটকে থাকতে দেখে, বড্ড দুঃখ হয়েছিল। কাটি দিয়ে ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু মাটিতে নেতিয়ে পড়ল।

তাই দেখে দাদা এমনি চটে গেল যে কাটি দিয়ে জালটাল ছিঁড়ে ফেলে দিল। মাকড়সাটা ওপরে ডাল থেকে জুলজুল করে সব দেখল। পরদিন সকালে দেখি দুই গাছের মধ্যিখানে মস্ত নতুন বারো-কোণা জাল ঝুলছে, তাতে শিশিরের ফোঁটা পড়ে, সকালের সূর্যের আলো লেগে, মনে হচ্ছে যেন হীরের মালা। মাকড়সাটা ওপরের ডালে বসে আছে।

তাছাড়া কত রকম শুঁয়োপোকা দেখতাম সে আর কি বলব! একবার একটা লোম-শূন্য সবুজ শুঁয়াপোকা পুষেওছিলাম। তা সে ব্যাটা কিছুতেই গুটি বাঁধল না। শেষটা বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়েও দিয়েছিলাম। এর ক'দিন পরে একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। বড় শীত, পা দুটো হিম। দিদি পাশে শুত, তার গরম গায়ে ঠাণ্ডা পা গরম করা যেত, কিন্তু দিদি বড্ড চটে যেত। কি আর করি! পা-দুটোকে সোজা করে দিলাম। অমনি নরম-গরম কি একটাতে পা ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে আরামের চোটে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি পায়ের নিচে, লেপের তলায়, কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা ছাই রঙের হুলো-বেড়াল ঘুমোচ্ছে! কেউ কিছু বলার আগেই, ঠেলেঠুলে তাকে খাট থেকে নামিয়ে দিলাম। সে আমার চটির ওপর শুয়ে থাকল। তখন তাকে বগলে করে, স্নানের ঘরে ঢুকে, জানলা দিয়ে বের করে দিয়ে, জানলা বন্ধ করে আবার ঘরে ফিরে এলাম।

দাদা-দিদিকে ছাড়া কাউকে কিছু বললাম না। এর পর থেকে মাঝেমাঝেই রাতে সে আমার পায়ের কাছে লেপের নিচে শুয়ে থাকত। আমার পা-দুটোতে খুব আরাম হত। কোথা দিয়ে ঢুকত জানি না। হয়তো স্কাইলাইট্ দিয়ে। কিন্তু বেরোতে পারত না। আমি রোজ তাকে বের করে দিতাম।

খুব খুশি ছিলাম। এই তো কেমন আমার বেড়াল পোষার শখও মিটছে, অথচ বড়রা কেউ জানতে পারছে না যে বকাবকি করবে!

একদিন আমাদের রান্নার লোক যামিনীদা এসে রেগেমেগে বলল, "পড়ন্ত আঁচে দুধের কড়াই চাপিয়ে রাখি, তার ওপর পুরু করে সর পড়ে, সে তো তোমাদেরি জন্যে! তাও আবার দুপুরে খাম্‌চে-খুম্‌চে নষ্ট করা ধরেছ! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!" বলে চলল মা-র কাছে নালিশ করতে।

আমরা তো হাঁ! আমরা কেউ দুধের কড়াইয়ের ধারেকাছেও যাইনি তো সর খাম্‌চাব কখন? তাছাড়া যামিনীদা নিজে রান্নাঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে, সুজি কিনতে শশীবাবুর দোকানে গেছিল। কারো পক্ষে ঘরে ঢোকা সম্ভব ছিল না। জানলাতে কাঠের মোটা শিক লাগানো। কাজেই নালিশ টিকল না। মা বললেন, "নিশ্চয় কড়াইটা কোনো কারণে নড়ে গিয়ে ঐ কাণ্ডটি

ঘটেছে।” তবু যামিনীদা আমাদের দিকে বিষদৃষ্টি হানতে হানতে চলে গেল।

এর কয়েক দিন পরে, বিকেলে ফিরে এসে রান্নাঘরের তালা খুলে, যামিনীদার চক্ষুস্থির! রাতের আর পরদিন দুপুরের জন্য উঁচু শিকেয় তুলে রাখা, যত্ন করে ভাজা মাছগুলোকে কে থালাসুদ্ধ টেনে নিচে নামিয়ে, কতক খেয়েছে, কতক খাম্‌চে-খাবলে নষ্ট করেছে! দুধের সর আবার লণ্ডভণ্ড! ভূত দেখার মতো করে যামিনীদা সেদিকে তাকিয়ে আছে, এমন সময় শাঁ—আ! করে একটা ছাইরঙের হুলো-বেড়াল, যামিনীদার মাথার ওপর দিয়ে লাফ মেরে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে, পাশের বাড়ির কাঁটা-ঝোপের বেড়া টপকে, নিঃশব্দে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল! সেই সঙ্গে দুধের ও মাছের সব রহস্যও পরিষ্কার হয়ে গেল। সেদিন রাতে আলুর দম খেলাম। পরদিন দুপুরেও নিরামিষ হল। সেকালে ওখানে সপ্তাহে দু-দিন বাজার বসত, তখন মাছ পাওয়া যেত। লোকে নুন হলুদ মাখিয়ে সে-মাছ ভেজে রাখত, মৎস্যহীন দিনের জন্য। রান্নাঘরেও নিশ্চয় বিল্লিটা স্কাইলাইট দিয়েই ঢুকত। তারপর দুষ্কর্ম সেরে, লুকিয়ে থাকত। যামিনীদা দরজা খুললে চুপিসাড়ে পালাত।

যাই হোক, রান্নাঘরের স্কাইলাইট বন্ধ করে দেওয়া হল। দুধ খাওয়া, মাছ খাওয়া বন্ধ হল। রাতে একদিন এসেছিল শুতে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের জানলা খুলে ওকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিলাম। তারপর আর আসেনি। ভাবলাম বোধহয় লজ্জা পেয়েছে।

এর পর একদিন পাশের বাড়ির কাউই সাহেবের রান্নাঘরের বারান্দার ওপর চোখ পড়েছিল। দেখলাম কাউই সাহেবের দশটা পোষা বিলিতী বেড়াল আলাদা আলাদা দশটা চীনে-মাটির বাসন

থেকে টিনের মাছ খাচ্ছে আর একটা বেয়ারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে ; লোকটা মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে ঢুকছে আর অমনি শাঁ করে একটা ছাইরঙের হুলো-বেড়াল সরল-গাছ থেকে নেমে, যে-কোনো একটা বাটি থেকে এক টুকরো মাছ নিয়ে আবার সরল-গাছে গিয়ে উঠছে। রাতেও নিশ্চয় শোবার একটা নরম-গরম জায়গা করে নিয়েছে। সে যাই হোক, ও-আর আমাদের বাড়িতে আসেনি আর বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম, আমাদের বিল্লি-রোগ একদম সেরে গেছিল। আজ পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে কত বেড়াল এল গেল, প্রত্যেকটাকে আমার সমান খারাপ লাগে।

কুঁকড়ো

তা অমন সুন্দর পাখি, ঘরে একটু ময়লা করলে কি হয়— কুমু ভেবে পায় না। দেখতে দেখতে শুকিয়ে খরখর করে, কুমু হাতে করে তুলে ফেলে দেয়। হাত-ও ধোবার দরকার হয় না। কেউ টেরও পায় না। এক যদি না দেখে ফেলে। এত রাগের কোনো মানেই হয় না, কাকীর খোকাটা কি কম নোংরা, যাক্ গে সে কথা।

কাকী নাকি ভারি সুন্দরী, সবাই তাই বলে। শুনে কুমুর হাসি পায়। কুঁকড়োর কাছে ঐ কাকী! কুঁকড়োর মতো সাদা ধবধবে গা, হল্‌দে চক্‌চকে পা, লাল টুক্‌টুকে ঝুঁটি আছে কাকীর? প্রথমটা ছাড়েনি কুমু। আড় চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ময়লা করলে তো আমি ফেলি। কুঁকড়োকে রাতে কাঠ-গুদোমে রাখলে,

কাকীর মুন্নুকে সেখানে রাখতে হবে।'

কাকী রেগেমেগে মুন্নুকে কোলে তুলে, দুমদুম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল। রাগের চোটে খোঁপা খুলে গেল, এক রাশি কালো কোঁকড়া চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়ল। মুন্নু তার এক মুঠো মুখে পূরে কেশেটেশে একাকার।

তখন বাবা বলল, 'ছিঃ, কাকীকে কড়া কথা বলতে হয় না। ছেলেমানুষ তো।' কুমু শুনে অবাক! ঐ বুড়োধাড়ি নাকি ছেলে-মানুষ, বাবা যে কি বলে! কুঁকড়োর গলা জড়িয়ে সে আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু কুঁকড়ো থাকলে তবে তো! বাইরে খড়ের গাদায় চড়ে, সে ডানা ঝাপটাতে লাগল। কি ভালো দেখতে কুঁকড়ো। যখন এত্তটুকু তুলোর গুলির মতো ছিল, তখন কাকুই এনে দিয়েছিল। কিন্তু আজকাল ওকে দেখলেই বলে—'ইস্, জিবে জল আসছে যে রে কুমু! দে না আমাকে!' অবিশ্যি দেয় না কুমু। রাতে কুঁকড়ো ঘরের কোণে সেঁদিয়ে চুপচাপ থাকত। ভোর হলেই কুমু দরজা খুলে দিত। তার পর একদিন অন্ধকার একটু ফিকে হতেই, খুদে ঘুলঘুলি দিয়ে মুণ্ডু বের করে কুঁকড়ো বলল, কঁকর—কঁকর—কঁকর কুক্রু—কু! বাবা রেগে গেল, "এ্যাই কুঁকড়ো, চোপ!" কুঁকড়ো বলল 'কঁকর কঁকর কঁকর, করবি কি তু? কুক্রু-কু!'

তারপর চোখ লাল করে বাড়িসুদ্ধু সবাই উঠে এসে, কুঁকড়োর গলা ধরে টেনে ঘরের বার করে দিল। কুঁকড়োও অমনি ডানা ঝাপটে,

খড়ের গাদায় চড়ে, আকাশের দিকে মুখ তুলে, গলা ছেড়ে ডাক দিল, 'কুক্রু কু, আর কত ঘুমুবি তু ?' আর এধার থেকে, ওধার থেকে, বাঁশ বাগানের ওপার থেকে, শিমলি-নদীর ঘাট থেকে, পাহাড়তলীর বাট থেকে, পঁচিশ পাখি গলা ছাড়ল, 'কুক্রু কু! আছি মু!' আর ঘুমোয় কার সাধ্যি! গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে সবাই উঠে পড়ল। সবার মুখ গোমড়া, খালি মুন্নু তার ফোকলা মুখের একটা দাঁত বের করে বলল, 'কঁক্-কঁক্-কঁক্-কঁক্-কঁক্!' কাকী তাকে ধরে দিল ঝাঁকি। মুন্নু অমনি ভ্যাঁ!

সেই দিন থেকে কুঁকড়োর জায়গা হল কাঠ-গুদোমে। সেখানে পাহাড়তলীর বন থেকে বাবা কাকা কাঠ কেটে এনে, সারা বছরের জন্য রোদে শুকোয়। শুকিয়ে ঠনঠনে হলে কাঠ-গুদোমে তোলে। সেখানে কুঁকড়ো হয়তো সুখেই থাকে। বেড়ে জায়গাটা, ধুনো-ধুনো মিষ্টি গন্ধ, চেলা-কাঠ থেকে সুবাস ছাড়ে। কিন্তু অন্ধকারে একা থাকে কুঁকড়ো। কুমুর কান্না পায়।

একদিন সকালে ঝমরু এসে বলল, "মোরগ আগ্‌লে রাখিস্। এ-সময় বন থেকে শ্যাল নামে। শীতকালে সব ছোট জানোয়ার লুকোনো জায়গায় ঘুম দেয়। খিদের চোটে শ্যালরা গাঁয়ে আসে।"

কুমু বলল, "আমার কুঁকড়ো কাঠ-গুদোমে শিকলি-বন্ধ থাকে।" ঝমরুর কি হাসি। 'গুদোমের ছ্যালের আর চালের মধ্যে ফাঁক আছে না? বাইরে খড়ের গাদায় চড়ে সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকতে কতক্ষণ।'

'দেখতে পাবে না।' 'গন্ধ পাবে। কুঁকড়োর গায়ে বোঁটকা গন্ধ। তাছাড়া শ্যালরা অন্ধকারে দেখতে পায়, নইলে রাতে বনে শিকার ধরে কি করে?'

কুমুর বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। মুখে বলল, 'ধেৎ! বনের জানোয়ার গাঁয়ের মধ্যিখানে ঢুকবার সাহস পাবে না। গাঁয়ের লোকরা তীর-ধনুক নিয়ে তাড়া করবে না!' কিন্তু এর পর রোজ লোকের হাঁস-মুরগি রাতারাতি উপে যেতে লাগল। চারদিকে শেয়ালের পায়ের ছাপ!

রাতটা ভয়ে ভয়ে কাটত। ভোরে কুঁকড়োর কুক্‌রু-কু শুনে তবে কুমু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোত! এক দিন ঘুম ভাঙতেই মায়ের কাছে শুনল বাসু মামাদের বাড়ির হাঁসের ঘরের চাটাইয়ের দেয়ালে গর্ত করে দুটো হাঁস নিয়ে গেছে আর তিনটে হাঁসকে মেরে রেখে গেছে। তারা নাকি ধুলোর ওপর পা টান করে পড়ে আছে। গলা কামড়ে নিয়েছে, চারদিকে রক্ত-রক্ত!

কুমুর কান্না দেখে মা ঘাবড়ে গেল। 'আরে কি জ্বালা! বাসুরা আজ থেকে তীর-ধনুক নিয়ে পাহাড়তলীর পথ পাহারা দেবে। শ্যাল বাছাধনরা কেমন আসে দেখা যাবে!'

সে রাতে মোড়লের বাড়ি থেকে এক-দিন বয়সের দুটো পাঁঠার ছানা চুরি গেল। কেউ বলল মানুষ নিয়েছে, কেউ বলল শ্যাল। বাঁধানো উঠোন তাই ছাপ পড়েনি। মোড়লের লোকরাও তীর-ধনুক বের করল। মারাও পড়ল কয়েকটা শেয়াল। তাদের লাসগুলো বাঁশে ঝুলিয়ে গাঁয়ে আনা হল। গায়ে তখনো তীর বেঁধা। মরা শ্যালের গায়ে ছেলে-বুড়ো বাখারির খোঁচা দিতে লাগল। কুমু বাড়ি গিয়ে বমি করে, শুয়ে রইল। দুপুরে ভাত খেল না।

কাকী মহা বিরক্ত। 'এ কি বাড়াবাড়ি, বাপু! তোর কুঁকড়ো তো ঘরেই আছে। শ্যালের যা উপদ্রব! মেরেছে বেশ করেছে। তা একটু আনন্দ-ও করবে না?' কুমু বলল, 'ওয়াক্!' কাকী পালাল।

সারারাত পড়ে পড়ে ঘুমুল কুমু। পরদিন সকালে কুঁকড়ো চুপ। কাঠ-গুদোমের দরজা খুলে কুমু দেখল চালের কাছে এতটা ফাঁকা, তার নিচে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। কুঁকড়ো নেই!

চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে কুমু ছুটে বেরিয়ে এল। সব শুনে সবাই চুপ। খালি কাকা বলল, 'তখনি বললাম জিবে জল আসে, আমাকে দে! তা তো শুনলি না!' কুমু সেখান থেকে ছুটে পালাল।

এর পর আরো দু-দিন কাটল। আরো দু-দশটা পাখি ম'ল। চারটে শেয়ালও তীর খেয়ে ম'ল। তাদের শরীরগুলো পরদিন সকালে গাঁয়ের মধ্যিখানে, যেখানে পূজোর সময় যাত্রা হয়, সেই মাঠে একটা তেঁতুল-গাছ, তার ডাল থেকে ঝুলিয়ে রাখা হল। গাঁয়ের সবাই দেখতে এল। ছোটরা দূর থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। খুব সাহসীরা কাছে গিয়ে খোঁচাও দিল। কুমুও গেছিল মজা দেখতে। একটা ঢিল-ও ছুঁড়েছিল। তারপর হঠাৎ চোখ পড়ল মরা শ্যালটার জিব ঝুলে আছে, চোখ উল্টে গেছে।

আর কি সেখানে দাঁড়ায় কুমু! এক ছুটে বাড়ি গিয়ে সারাদিন কেঁদে ভাসাল। শ্যাল ম'ল, কিন্তু কুঁকড়ো তো আর ফিরে এল না। বগ্ড়ি, ঝমরু, শালিনী এরা তো অবাক! মোরগ গেছে শ্যালের পেটে, সে আবার ফিরবে কি করে! কুমু রেগে বকাবকি করতে লাগল। ওরাও সরে পড়ল।

মোড়লের হুকুম—খিদের চোটে শেয়ালের পাল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, তার যেন একটাও বাকি না থাকে! হয় তাড়াও, নয় মার! গাঁ-সুদ্ধ্ সবাই খুসি। তীর-ধনুক দা-কুড়ুল নিয়ে সব বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন শ্যাল শিকার চলল।

সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে কেউ নেই। মা আর কাকী গেছে ঠাকুর-

বাড়িতে, আনন্দ-নাড়ুর জন্য নারকেল কোরা, চাল কোটা হবে। বাবা, কাকা, বড়দাও দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বিকট হৈ-হৈ শোনা যাচ্ছে। শেয়ালের পাল এবার মজা বুঝছে। বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে!

এমন সময় কলা-বাগানের মধ্যে দিয়ে কি একটা সাদা রঙের জানোয়ার মাটিতে গা ঘষটাতে ঘষটাতে, লাল চোখ দিয়ে জল ফেলতে ফেলতে, হাট করে খোলা কাঠ-গুদোমের দরজার কাছে পৌঁছে, মানুষের মতো গোঙাতে গোঙাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার পেটের কাছে দুটো তীর বিঁধে আছে, রক্ত পড়ছে। দূরে, গাঁয়ের লোকদের হো-হো শুনে, জানোয়ারটা নিজের শরীরটাকে টেনে টেনে কোনোমতে গুদোম-ঘরে ঢুকে, আবার পড়ে গেল। কুমুর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল, গলা শুকিয়ে কাঠ।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট চ্যাচাতে চ্যাচাতে দু-চারজন বাইরের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। কুমু কাঠ-গুদোমের দরজা বন্ধ করে, বাইরে থেকে শিকলি তুলে, দু-ফোঁটা রক্ত পড়েছিল তার ওপর মাটি ছড়িয়ে দিল। ঠিক কুঁকড়োর রক্তের মতো। বাবা কাকা এসে দেখল বাড়ি চুপচাপ, কুমু চোখ বুজে শুয়ে আছে। "এখানে নেই, এখানে নেই, এগিয়ে চল! ঐ বুঝি পালায়!" আবার সব চুপচাপ।

পর দিন সকালে কাঠ-গুদোমের দরজা খুলেই মা একেবারে থ'! দোরের সামনে এতখানি জায়গা জুড়ে মা-শেয়ালটা মরে পড়ে আছে আর তার কোল ঘেঁষে এতটুকু একটা বাচ্চা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। দুজনার রং প্রায় সাদা। মায়ের বগলের তলা দিয়ে গলে, বাচ্চাটাকে তুলে বুকে জড়িয়ে কুমু আবার গিয়ে শুল। মা দেখল কি দেখল না বোঝা গেল না।

শেয়াল শিকারের কথা শুনে খবরের কাগজের লোকরা জীপে চড়ে এসেছিল। সাদা শেয়াল শুনে তারা দেখতে এল। কি দুঃখ তাদের! 'আহা! মেরে ফেললেন! সাদা শেয়ালের অনেক দাম! খুব একটা দেখা যায় না। এ জানোয়ার কি মারতে হয় কখনো!' তখন কাকা বলল, 'যিনি এ-কথা বললেন তিনি নাকি পশু-সংরক্ষণের লোক। ওরা নাকি জানোয়ার বাঁচায়, মারে না।' তাই শুনে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে কুমু বেরিয়ে এল। সবাই তো হাঁ!

সেই লোকটির কোলে বাচ্চাটাকে দিয়ে কুমু বলল, "ওর নাম কুঁকড়ো। ওকে বাঁচাও, মেরো না।" বলে দৌড়ে পালাল।

হরিয়াল

যদিও টেরেন চেপেছে, আসলে কিছু জুতো সাফের কাজ জানে না পটো। তবে ঐ মিনি-পয়সায় রেল চাপা যায় আর কিছু না হোক, চল্লিশ-পঞ্চাশ পয়সা তো লাভ হয়। তার অর্ধেক অবিশ্যি বর্মী নিয়ে নেয়, তবু বাকি যা থাকে তাই দিয়েই তেল নূন শুকনো লংকাটা শাকটা কিনে ঠামাকে দিতে পারে। ঠামা তিন বাড়িতে বাসন মেজে চাল আর আটা কেনে। তাতেই ওদের চলে যায়। থাকে একটা ঝোপড়ামতোতে। তবে সব সময় খিদে, সব সময় খিদে। পথের ধারের গাছ-গাছড়া থেকে যা পাওয়া যায়, পেড়ে খেতে হয়।— এই রে! ছুটো সায়েব উঠল।

লাল সায়েব দেখেনি পটো। এ লাইনে তারা আসে না। এই

কালো সায়েবরাও কিচ্ছু কম যায় না। কেমন প্যাণ্টেলুন পরা, চকচকে জুতো পায়ে। ভেতরে যাবার সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে একটা সায়েব রেলের চা-ওয়ালাকে বলল, "ফাস্ট ক্লাস গাড়িতে আবার এরা কেন ?"

চা-ওলা বলল, "জুতো সাফ করে সায়েব। অনেকে চান। ভালো ছেলে। আর ও বুড়োটা চোখে দেখে না। বর্ধমানে নেবে যাবে।" সায়েবদের সঙ্গে বন্দুক ছিল। ছুটো লোক-ও ছিল, খাকি কুর্তা প্যাণ্টেলুন পরা। একজন কতকগুলো সোঁদর সোঁদর থলি, ব্যাগ্ নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। অন্য লোকটা এক গাদা মরা পাখি পটোর সামনে ফেলল। পটো শিউরে উঠল।

মরা হাঁস, বুনো পায়রা, হরিয়াল।

হরিয়াল! কি সুন্দর দেখতে! আহা, ওকে কি বলে মারল! ঠিক সবুজ রঙের পায়রার মতো—ইস্! পাখিটা চোখ মেলে একবার হাঁ করল। গাঢ় রঙের চোখ, সে ঘোর লাল, না ঘোর নীল, তা বোঝা যায় না। মরেনি। বোধ হয় জল-তেষ্টা পেয়েছে! চোখের মধ্যে কি কষ্ট, কি কষ্ট!

পটো লোকটার দিকে চেয়ে বলল, "ওর তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল দিলে ভালো হয়।" লোকটা বিশ্রী করে হাসল।

"তোর দেখছি দোয়ার শরীল! ওগুলো কি হবে জানিস্?

বদ্ধমানের কাছে মিলিংটারি তাঁবু আছে, সেখানে নে গিয়ে, ছু-দিন দড়িতে টাঙিয়ে রাখবে। মাংস লরম দেবে। তাপ্পর লামিয়ে নে, পালক ছাড়িয়ে, মশলা মাখিয়ে, শিকে বিঁধিয়ে কাঠ-কয়লার আগুনে ঝল্‌সাবে। তখন তার যা খোস্‌বাই ছাড়বে, সে নাকে গেলেও ভাববি বুঝি সগ্‌গে গেছিস্‌! সবগুলোর সমান তার হবে। কোনটা হরা-রঙের, কোনটা কেলে-কুচ্ছিৎ কিচ্ছু মালুম দেবে না। নে, সরে বোস্‌। হাত লাগাস্‌ না ; সব গুণিগোন্‌তা আছে। আমরা পাশের কামরায় যাচ্ছি, যদি কিছু নষ্টামি করিস্‌ তো আস্ত রাখব না।"

পটোর গা গুলোচ্ছিল। সে আরেকটু সরে বসল। বুড়ো চাকরটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখ আগুনের মতো জ্বলছিল। "হরিয়ালটা তো জিন্দা আছে। গায়ের পাশ দিয়ে গুলি লেগে বেরিয়ে গেছে দেখছি। বেশি জখম হয় নি। খালি তাড়স লেগেছে।"

চাকরটা দরজা দিয়ে নামতে নামতে বলল, "ও বাবা! মড়াটাও যে কথা বলে! দড়িতে ছুদিন ঝুলে থাকলে, ও জিন্দা আর মুর্দাতে কোনো ফারাক থাকে না, বুঝলে!" এই বলে দরজার হাতল ধরে ঝুলে নেমে পড়ল। অন্য লোকটাও ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নেমে গেল। ঠিক সেই সময় গাড়িও ছেড়ে দিল।

যেই না গাড়ি ছাড়ল, পটো উঠে পড়ল, বুড়ো বলল, "কোথায় যাও, বাপ ?" "ওকে একটু জল দিই।" "আমার বদনায় খাবার জল আছে, তাই দাও।"

তাই দিল পটো। পাখিটা হাঁ করে ফোঁটা ফোঁটা অনেকখানি জল খেল। তারপর ডানা ঝাপটাবার চেষ্টা করল। বুড়ো বলল, "রও!" এই বলে, ফতুয়ার পকেট থেকে বাঁকামতো একটা ছোরা বের করে, পাখিটার পায়ের বাঁধন কেটে দিল। ছু' হাতে পাখিটাকে ধরে তাকে

পায়ের ওপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করল পটো। পাখি এলিয়ে পড়ল। পটোর কান্না পেল। তবে বোধ হয় বাঁচবে না। গুলি খেয়ে কেউ বাঁচে ?

বুড়ো ওর মনের কথা টের পেয়ে বলল, "নিশ্চয় বাঁচবে। গুলি ওর গায়ে বেঁধেনি। এতক্ষণ বাঁধা ছিল, তাই পায়ে খিল ধরে গেছে। খায়ওনি নিশ্চয় অনেকক্ষণ।" চাদরের মধ্যে থেকে দুটো ময়দার গুলির মতো কি যেন বের করে পাখির সামনে ধরতেই, সেগুলোকে ঠুকরে খেয়ে নিল হরিয়াল। বুড়ো তখন দু' হাতে আল্‌গোছে ধরে, নিজের জামার বুকের মধ্যে গুঁজে রেখে পটোকে বলল, "সামনের গুমটিতে গাড়ি আস্তে করবে, সেখানে আমাদের নামতে হবে। নইলে গোণা-গুন্তির পাখি নিয়ে সোরগোল তুললেই মুশ্‌কিল।"

এই বলে থলিটা তুলে নিয়ে, গাড়ির বেগ একটু কমতেই বুড়ো টুপ করে নেমে গেল। পটোও নামল। পথ বলে কিছু ছিল না ওখানে। নিতান্ত আঘাটা। বুড়ো তাড়াতাড়ি গাছ-গাছলার আড়ালে গিয়ে ওকে ডাকতে লাগল। "চল, চল, পাখিটার গায়ে একটু ওষুধ করতে হবে। যাতে না পাকে।"

বনের মধ্যে একটা মাটির ঢিপিতে বসে বুড়ো খুদে একটা কৌটো থেকে হলুদ রঙের ওষুধ বের করে, পাখির ব্যথার জায়গায় আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিল। পাখি একটু ধড়ফড় করে উঠল, একবার ডানা ঝাপটাল। তখন খুব যত্ন করে পটোর হাতে পাখি দিয়ে বুড়ো বলল, "ওকে আমি তোমাকে দিলাম। আর কিছু হবে না ওর।"

পটো বলল, "উড়তে পারবে ?" "নিশ্চয় পারবে। আমরা জাত পাখিওলা। পাখি দেখেই পাখি চিনি। মানুষ-ও।"

পটো উঠে দাঁড়াল। "আমি পাখি চাই না।"

তারপর পাখিসুদ্ধ দুই হাত মাথার ওপর তুলে, ছোট একটা

ঝাঁকি দিয়ে, বুড়ো হাতের মুঠি খুলে দিল। পাখিটা একবার ডানা ঝাপটে, মাথার ওপর এক পাক ঘুরে, শাঁ করে উড়ে গেল।

তখন বুড়ো পটোর চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "স্টেশন থেকে তুমি আমার পিছু নিয়েছ কেন?" পটো পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলল, "তোমার ডান হাতে যে ছ-টা আঙুল! ইস্টিশনে তোমার ছবি টেঙিয়েছে, চেনা যায় না। এই দাড়ি-গোঁপ, ডাকাতের মতো দেখতে। আর ডান হাতে ছ-টা আঙুল। বলেছে তুমি নাকি চাল-চোরাদের পাণ্ডা। তোমার নাম ওস্তাদ। তোমাকে ধরিয়ে দিলে দু' শো টাকা দেবেক্। তুমি এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাও। নইলে কে ধরিয়ে দেবে।"

"তুমি কেন দিচ্ছ না? বেশ দুশো টাকা পাবে।" পটো বলল, "তুমি কেন পাখি উড়িয়ে দিলে?"

বুড়ো হেসে বলল, "এবার দাও দিকিনি আমার জুতোটা সাফ করে।" এই বলে জঘন্য নোংরা ঠ্যাং দুটো, তার চেয়েও জঘন্য ছেঁড়া চটিসুদ্ধু এগিয়ে দিল।

চটি চলনসই গোছের সাফ হলে, বুড়ো পটোকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলল, "খুব ভালো কাজ হয়েছে। এটা রেলের রোজগার নয়। এর অর্ধেক বর্মীকে দিতে হবে না। তাছাড়া বর্মী এখন হাজতে।"

এই বলে উঠে পড়ে বলল, "এবং আমিও ওস্তাদ নই। যদিও আমার ছ-টা আঙুল। আঙুলটা অবিশ্যি সত্যি নয়।" বলে পড় পড় করে খুলে ফেলল আঙুলটা। পটোর থুত্নি ঝুলে পড়ল।

বুড়ো বলল, "আমি সরকারি টিকটিকি। আমাদের বাগানে কাজ করবার লোক দরকার। গুদোম আছে। ঠামার সঙ্গে থাকতে পারবে। চল।"

বড় জ্যাঠামশায়ের গল্প

আমার বড় জ্যাঠামশাইকে লোকে বেজায় ভয় করত। ভয় করবার মতোই মানুষটাও ছিলেন তিনি। এই বিরাট দশাসই চেহারা, যাকে বলে পেটানো শরীর, বলিষ্ঠ, জোরালো। এক মুখ দাড়ি-গোঁপ, আর কি গলা! একটা হাঁক দিলে বাড়ি কাঁপত। আর যেমনি গলা, তেমনি রাগ! আমাদের দেশে তিনিই প্রথম ক্রিকেট খেলার প্রচলন করেন। সাদা পেণ্টেলুন পরে আর মাথায় সেকালের ক্রিকেটিং টুপি দিয়ে যখন ব্যাট হাতে উইকেটের সামনে দাঁড়াতেন, দর্শকরা স-সম্ভ্রমে বলত, "এই রে! স্বয়ং ডবলু জি গ্রেস্ এসেছে!" তিন পুরুষ বাঙালীর ছেলেকে মাঠে নামিয়ে বড় জ্যাঠামশাই খেলোয়াড় বানিয়ে দিয়ে-ছিলেন। তার আগে পর্যন্ত ছাত্রদের অভিভাবকরা মনে করতেন যে খেলার মাঠে নামলেই ছেলেরা গোল্লায় যাবে! বড় জ্যাঠামশায়ের নাম ছিল সারদারঞ্জন রায়।

নিজেও পরম পণ্ডিত ছিলেন। অংকে আর সংস্কৃতে এম্-এ। এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজের—সেকালে বলা হত

মেট্রোপলিটান কলেজ—অধ্যক্ষ ছিলেন বহুকাল। একদিকে যেমন সংস্কৃত ব্যাকরণের বই লিখেছিলেন, বইয়ের দোকান করেছিলেন, তেমনি এস্‌প্ল্যানেডের এস্ রায় এণ্ড সন্সের খেলার সরঞ্জামের দোকানটিকে সবাই চিনত। মাছ ধরার কি ভালো ছিপ্ পাওয়া যেত সেখানে! বিদেশে চালান যেত। প্রত্যেকটি বাঁশ নিজের হাতে বাছাই করা।

সে যাই হোক গে, যত বড় পণ্ডিত আর যত বড় খেলোয়াড়ই হন না কেন, বাড়ির ছেলেমেয়েরা আর আত্মীয়-স্বজনরা—তা তাদের যত বয়স-ই হোক না কেন—বড় জ্যাঠামশায়ের গলার আওয়াজ শুনলেই থরথর করে কাঁপত। আমার ঠাকুরদা কম বয়সে মারা যান, তখন থেকেই বড় জ্যাঠামশাইয়ের ওপর ছোট ভাইদের মানুষ করার ভার পড়েছিল। ধমকধামক তো বটেই, দরকার হলে কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম দিয়ে ভাইগুলোকে আর পরে ভাইপোদের অনেককে দিব্যি শক্ত-পোক্ত বানিয়ে দিয়েছিলেন। এক মেজভাই উপেন্দ্রকিশোর বাদে। তার কারণ চার বছর বয়স থেকে তাঁকে তাঁদের এক দূর সম্পর্কের কাকা দত্তক নিয়েছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরকে কখনো খেলার মাঠে দেখা যেত না। তাঁর ছেলেরাও দর্শক ছাড়া অন্য কোনো ভাবে যেত কিনা সন্দেহ। অন্য ভাইদের বড় জ্যাঠামশাই মনের মত করে মানুষ করবার চেষ্টা করতেন।

তারা যখন খুব ছোট, তখন মায়ের সঙ্গে দেশের বাড়িতে থাকত। সে দেশটিও তেমনি জায়গা। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের মসূয়া গ্রাম। ব্রহ্মপুত্র নদ সেকালে বাড়ির পাশ দিয়ে গর্জন করে ছুটে যেত। এখন সরতে সরতে তিন ক্রোশ দূর দিয়ে যায়। নদী-নালা, বন-বাদাড়ের দেশ। তেমনি সুন্দর সুন্দর আম-কাঠালের বাগান, বড় বড় পুকুর।

তাতে মাছ কিলবিল করত।

বন থেকে বাঘ আসত। ছোটখাটো বাঘ নয়, সত্যিকার ডোরা-কাটা বড় বাঘ। গ্রামের মধ্যে দাপিয়ে বেড়াত। এর ছাগল, ওর বাছুর নিয়ে যেত। গ্রামবাসীদের অভ্যাস হয়ে গেছিল। বাঘের কাশি শুনলেই ক্যানেস্তারা পিটিয়ে, হৈ-হল্লা করে, তাকে তাড়াবার চেষ্টা করা হত। দুমদাম করে দরজা-জানলা বন্ধ করে ছেলেপুলে, পাঁঠা, বাছুরদের নিরাপদ করা হত। বাঘ চলে গেলে যেমনকে সেই।

তবে আমার বাবার ছোটবেলায় বাঘের উপদ্রব অনেক কমে গেছিল। মাঝে-মধ্যে দেখা যেত। যদিও মুখে মুখে বাঘের গল্প ফিরত। সে বড় মজার সব গল্প। বাবার এক বুড়ি পিসি একদিন দুপুরে নারকেল-গাছ থেকে নারকেল পাড়াচ্ছেন। হারু ছোকরা গাছে চড়েছে, পিসি দুটো কচি ডাব একসঙ্গে বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে, হারুকে চালাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর নাতনি এসে খবর দিল তেঁতুল-তলায় বাঁধা সাদা বাছুরকে বাঘে ধরেছে!

আর যাবে কোথায়! পিসি যেমন ছিলেন তেমনি ছুটলেন তেঁতুল-তলায়। গ্রামের পুরুষরা ক্ষেতে কাজ করছিল। হারুর চিৎকার আর মেয়েদের হাউমাউ শুনে, লাঠি-সোঁটা নিয়ে ছুটে এসে দেখে ততক্ষণে ডবল-ডাবের বাড়ি মেরে পিসি বাঘের দফা রফা করে দিয়েছেন।

বাবারা অবিশ্যি আরো কম বাঘ দেখেছিলেন। তখন ঠাকুমার কাছে থাকেন বাবা আর আমার ছোটজ্যাঠা—তাঁর নাম ছিল কুলদা-রঞ্জন, তাঁর লেখা অনেক ছোটদের বই আছে। মায়ের কাছে গ্রামে থাকেন, পাঠশালে পড়েন আর গ্রামময় দুরন্তপনা করে বেড়ান। ভয় করার কেউ ছিল না। বড়দাদা, মেজদাদা, সেজদাদা কলকাতায়।

এমন সময় চিঠি এল পূজোর ছুটিতে সবাই দেশে আসছেন।

পূজোয় দেশে আসছেন মানে বাক্স-প্যাঁট্‌রা বোঝাই কলকাতার চিনির মিষ্টি, কাপড়চোপড়, চকচকে নতুন জুতো, ছাতা ইত্যাদিও আসছে। বড়দা কবে আসবেন বলে দুই ছোট ভাইয়ের আর তর সয় না! অবিশ্যি আমাদের দেশে সেকালে বড়দা, মেজদা না বলে, সবাই বলত ঠাকুরদা, ছোট্ ঠাকুরদা ইত্যাদি। রোজ দুই ভাই বলে, "কবে আইব?"

এলেন দাদারা তিনজন, রাজ্যের খাবারদাবার জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড়, জুতো-ছাতা নিয়ে। কিছু বইও এসেছিল নিশ্চয়, তবে সেকালে ছোটদের বইতে ভালো ছবি থাকত না। এদেশে ভালো ছবি ছাপাই হত না। বাবা আর ছোট জ্যাঠার আহ্লাদ আর ধরে না। এত জিনিস এক সঙ্গে কবে আর পেল তারা!

এখন মুশকিল হল বড়দার শাসনটা বড্ড বেশি কড়া। তিনদিনের দিন দুই ভাই মা-কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ঠাকুরদা কলকাতা যাবে কবে?" ঠাকুমা যে মহা চটে গেলেন সে তো বলাই বাহুল্য।

বড়দা দুজনকে দুটি ছোট ছিপ দিয়ে বললেন, "চল্, মাছ ধরতে যাই।" এই তারা টের পেয়ে গেল মাছ ধরার কি মজা! মনে হল তত খারাপ নয় ঠাকুরদা!

আরেক দিন বললেন, "বুনো শেয়াল এসে রোজ রোজ নদীর ধারে গ্রামের লোকদের ক্ষেত থেকে ফুটি, ঘর থেকে হাঁসের ছানা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওগুলোকে শিকার করা দরকার। চল্, ফাঁদ পেতে শেয়াল ধরার ব্যবস্থা করা যাক।"

আর বলতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাই তৈরি। সবাই মিলে তার, জাল, কাঠ, দড়ি, হাতিয়ার যা যা দরকার সব নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে মজবুত করে গোটা তিনেক ফাঁদ তৈরি করে ফেলল। পরদিন

ভোরে গিয়ে দেখল তাতে শেয়াল বাছাধনরা পড়েওছে। গ্রামের লোকরা মহা খুসি।

এমনি করে দু-চার দিন গেল। রোজ শেয়াল পড়ে। বাবার আর ছোট জ্যাঠার সব চেয়ে উৎসাহ বেশি। বড়দা কখন উঠে, ফাঁদ দেখতে আসবেন, তার জন্যে তর সয় না! গেলেন দু-ভাই নিজেরাই ফাঁদ দেখতে। সেদিন আর ফাঁদে-পড়া শেয়ালের গজ্‌রানি শোনা যাচ্ছিল না।

কাছে গিয়ে দেখেন কোথায় শেয়াল! প্রথম ফাঁদের সমস্ত ভেতরটা জুড়ে বসে আছে হাঁড়িপানা মুখটি করে অদ্ভুত একটা জানোয়ার। গোল মাথা, মস্ত হাঁ, লম্বা ল্যাজ, সারা গায়ে হলদে রঙের ওপর কালো ডোরাকাটা!

বাবাদের চ্যাঁচামেচি শুনে গ্রামের লোকরা, মায় বড় জ্যাঠা-মশাই ইত্যাদি ছুটে এসে দেখেন, কি সব্বনাশ! শেয়ালের ফাঁদে হাঁড়িমুখ করে বাঘ বসে আছে! গ্রামময় সে কি হৈ-চৈ। বাঘটাকে শেষ পর্যন্ত ময়মনসিংহ শহরে পাঠানো হয়েছিল। তারপর হয়তো কোনো চিড়িয়াখানায়। কিন্তু সমস্ত ব্যাপার দেখে ঠাকুমা বড় জ্যাঠামশাইকে এত বকাবকি করলেন যে তিনি শেয়াল ধরার ফাঁদগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হলেন। ছোট দুই ভাইয়ের কি দুঃখ! ঐ তাঁদের প্রথম বাঘ দেখা।

জল

ব্রহ্মপুত্র যখন হিমালয় ফুঁড়ে তিব্বত থেকে নেমে ভারতে এসে পৌঁছয়, যেমনি তার রূপ তেমনি তার দাপট! লোকে বলে নদী তো নয়, এ হল নদ! আরেকটু এগিয়ে আরেকটু জোর পেয়ে, আরো পাঁচটা নদীর জলে ফুলে ফেঁপে, নয় কিলোমিটার চওড়া খাতের মধ্যে গড়াগড়ি খায়। কখনো এ-তীর ঘেঁষে বয়ে যায়, কখনো ও-তীর। ফুঁসতে ফুঁসতে গর্জাতে গর্জাতে যখন যায়, তীরবাসীরা যেমনি তাকে ভয় করে, তেমনি ভালোও বাসে।

হিমালয়ের পায়ের কাছে তার রূপ খোলে সব চেয়ে বেশি। পেছনে বরফের পাহাড় আকাশের গায়ে একটা ছবি আঁকা পরদার মতো ঝুলে থাকে। বরফের পাহাড়ের নিচে নীল দূরের পাহাড়। তারপর সবুজ কাছের পাহাড়। ঘন বনে ঢাকা। সরল গাছ, ঝাউ গাছ, কত ফলের গাছ, বাঁশবন। বাঁশবনে বড় বড় জানোয়ার থাকে; আগে আরো বেশি থাকত। আরো নিচে ঘাসের বন, কোথাও এক মানুষ দেড় মানুষ উঁচু। হাতির পিঠে-বসা শিকারীসুদ্ধু তার মধ্যে ডুবে যায়, দেখতে পাওয়া যায়

না। গণ্ডার আছে, বাঘ-ও আছে, বুনো শুয়োর আছে। ঘন বনের মধ্যিখানে হাতির পাল আছে।

পুন্নুরা থাকত পাহাড়ের পায়ের থেকে একটু ওপরে, বনের গা ঘেঁষে উঁচু ডাঙা, তারি কিনারায়। ডাঙায় যে ভুট্টা হত, সে বড় মিষ্টি ভুট্টা; রাঙা-আলু হত; লাল গোল-আলু হত; একটা পাতকুয়ো ছিল ওদের; ঢেঁকি ছিল; বাবা ধান কিনে আনত; মা পাড়ি দিয়ে ধান ভেনে লাল গোল মিষ্টি চাল বানাত। ওদের চারটে মুরগি ছিল, রোজ ডিম দিত। বন থেকে বাবা চাক ভেঙে কমলা-মধু আনত। চালের গুঁড়ি দিয়ে মা মোটা মোটা রুটি বানাত, পুন্নু মধু দিয়ে খেত।

বাবা একবার শহরে গেল মধু বেচতে। যেতে দু-দিন, আসতে দু-দিন, সেখানে থাকবে দু-দিন, কাপড়-চোপড় কিনে আনবে। এমন সময় বৃষ্টি নামল। সে কি বৃষ্টি! আকাশ ঝেঁপে, চারদিক লেপে-পুঁছে পড়ছে তো পড়ছেই।

বুড়ি ঠামু গরমের জন্য রান্নাঘরে শুত। সে-ও ব্যস্ত হয়ে ছোট জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "এমন বিষ্টিতে বন্যা হয়। চারদিক ডুবে যায়, মানুষ-গরু মরে যায়। ছোট ছেলেপুলে বাঁচে না। ও বৌ, পুন্নু লায়েক হয়েছে, ওর আট বছর বয়স, কিন্তু খোকাটার তো গায়ে জ্বর, ওকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।"

অমনি মা-ও কাঁদতে বসল। তা কাঁদবার সময় কোথায়? বুক-জল ভেঙে কুসমির মা তার তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ওদের বাড়িতে এসে উঠল। পুন্নু বলল, "এসো, এসো, আমাদের ভাত রান্না হচ্ছে।"

ঠামু তো রেগে টং। "এত লোক খেলে, কাল সবাই উপোস করবে।" মা বলল, "এলে যে, কাঁথা-কম্বল এনেছ?" খিদে ছাড়া কিছু আনেনি ওরা, সব কিছু জলে ভেসে গেছে।

পুন্নু বলল, "উনুনের পাশে সবাই মিলে শোব, মা।" ঠামু বলল, "উনুন জ্বালতে কাঠ লাগে। সে কি তুমি আনবে? আনলেও সে ভিজে কাঠে ধোঁয়া হবে, তাপ হবে না।"

জড়সড় হয়ে বসে কুস্‌মির মা বলল, "কিছু দরকার নেই আমাদের, একটু শুকনো জায়গা পেয়েছি, এই ঢের।"

কুস্‌মি আর তার ভাইরা বলল, "আমাদের খিদে পেয়েছে।"

পুন্নু ওদের কড়িকাঠে ঝুলোনো পাকা ভুট্টা পেড়ে দিল। বিকেলে জল আরো বাড়ল। ডুব-জলের বেশি হল। ঠামু বলল, "যাক, একটা ভালো হল যে আর কেউ আসতে পারবে না।"

সন্ধ্যায় ভালুক-নাচওয়ালা বুড়ো বালাং তার ভালুক নিয়ে সাঁতরে এল। মা-ও গেল চটে, "এ তোমার কেমন আক্কেল, মামা, জ্বোরো ছেলে নিয়ে কোনোমতে আছি, আবার একটা ভিজে ভালুক নিয়ে এলে!"

পুন্নু বলল, "সাঁতরে এসেছে মা, তা ভিজবে না? আমার ছাড়া ইজেরটা দিয়ে ওর গা শুকিয়ে দিচ্ছি।" ভালুকের গা থেকে ভিজে কম্বলের মতো গন্ধ বেরোচ্ছিল।

ঠামু বলল, "আশা করি ওটাকেও খেতে দিতে হবে না।"

ভালুকটা পুন্নুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। পুন্নু দেখল ভালুকের চোখে জল চিকচিক করছে। নিজের রুটি থেকে আধখানি ছিঁড়ে তাকে দিল। বুড়ো বালাং বলল, "আমার খিদে নেই। অনেক পান খেয়েছি সকালে।"

রাত দুপুরে দরজায় খট্‌খট্‌—গুণী পাঞ্জালী কাঁদতে কাঁদতে এল। তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। বন-জঙ্গল জলে ভেসে গেছে, হাতিরা সব আরো উঁচু পাহাড়ে উঠে গেছে। তাদের সঙ্গে ওর একমাত্র সম্বল,

কুন্‌কী হাতি তুগ্‌গা-ও চলে গেছে। যারা হাতি ধরার খেদা করে, তারা অনেক টাকা দিয়ে তুগ্‌গাকে আর গুণীকে নিয়ে যায়। বুনো হাতি ভুলিয়ে আনে ওরা। তুগ্‌গার সঙ্গে গুণীর ছেলে মণিও নিখোঁজ।

কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে রেগেমেগে ঠামু বলল, "হাতির দয়ায় অনেক টাকা তো কামিয়েছ, এখন না-হয় সে গেছে। তা অত বিলাপ কিসের ? ছেলেটা তো লক্ষ্মীছাড়া !"

গুণী কেঁদে বলল, "আমার ছেলে ঘরবাড়ি টাকা-কড়ি সব ডুবে গেছে, মাসি, আমাকে কড়া কথা বল না। তিন দিন কিছু খাইনি।" পুন্নু মাচা থেকে শকরকন্দ পেড়ে পোড়াতে বসল। যখন সকাল হল দোর খুলে পুন্নু দেখল, কোথা থেকে ছোট বড় রোগা মোটা কালো ধোলো পাটকিলে সাতটা কুকুর এসে দাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। পুন্নুকে দেখেই তারা সরু সরু ল্যাজ নেড়ে বলল, "খেউ-খেউ-খাঁউ-খাবার-কোথা-পাঁ-উ আঁউ-আঁউ-আঁউ-উ !"

এ তো মহা জ্বালা। পুন্নু ঢোক গিলে, নিজের ভাগের সব ক'টি ভুট্টার বড় বড় খই সাতটা কুকুরের সামনে ছড়িয়ে দিল।

এবার ঠামুর আর মায়ের রাগ দেখে কে! "এত দয়া কিসের শুনি ? বাড়িতে একমুঠো খাবার নেই, একটা চ্যালা কাঠ নেই, কুয়োর জল ছাড়া কিছু নেই ! ভগবান যাদের ভুলেছে তাদের অত দান কিসের শুনি ? কেউ জানে না আমরা এখানে না খেয়ে মরছি।" পুন্নু হঠাৎ বলে বসল, "ভগবান কাউকে ভোলে না, বাবা বলেছে !"

তাই শুনে ঠামু আর মা তখন হাউ-হাউ কান্না জুড়ল, "কেউ আসবে না আমাদের কাছে ! এই জলে সরকারের জীপ্‌ গাড়িও ডুবে যাবে !!" বলতে বলতে মা-ঠামুর মুখ হাঁ ! ঐ তো জলের মধ্যে দিয়ে কালো একটা কি আসছে ইদিক পানে। চেয়ে চেয়ে যখন পুন্নুর

চোখ ব্যথা হয়ে এল, তখন বাজপাখির মতো চোখওয়ালা গুণী পাঞ্জালী দু-হাত তুলে চ্যাচাতে লাগল—"ওরে ভগবান শুনেছে রে! ঐ ছাখ, তুগ্‌গা পিঠে করে পুন্নুর বাপকে, আমার মণিকে, আর খাবারের বস্তা নিয়ে আসছে!"

হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে সবাই তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কারণ বৃষ্টি পড়াও থেমে গেছিল।

আজগুবি নয়

মুদীর দোকানটা গঙ্গার খুব কাছেই, দাওয়ায় বসলে ওপারটা দেখা যায়, ঘন বনে ভরা। এদিকে গাছ-গাছড়া, ধানক্ষেত, গ্রামের বাড়িঘর। মাথার ওপরে একটা আংটা থেকে একটা লণ্ঠন ঝুলছে। মুদী বলল, "ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসবেন না, বাবু, কি জানি!"

চটপট ঠ্যাং গুটিয়ে নিয়ে ছোটমামা বললেন, "কি জানি আবার কি? ও অমরেশ, এদের কথা শুনলে গা শির-শির করে, তোমার জিজ্ঞাসাবাদ হল?"

ছোটমামার বন্ধু অমরেশ হল গিয়ে সাংবাদিক, তার কথার আর শেষ নেই। ওরা আলু পেঁয়াজ চাল ডাল এনেছিল, মুদীর দোকানের পিছনে ছোকরা চাকর দামু খিচুড়ি আর ঝালঝাল আলুর দম রাঁধছিল। তার একটু একটু গন্ধও আসছিল, আবার মুদী আর তার বন্ধুরা রাজ্যের ভয়ের গল্প জুড়েছিল; মন্দ লাগছিল না। বাইরে সমানে বৃষ্টি পড়ছিল।

মুদী বলল, "ঝড়খালির ওটা বাঁচবে কেন, ওটা তো আর সত্যি বাঘ ছিল না।" অমরেশ কাকা খাতায় সে-কথা টুকতে গিয়ে থেমে বলল, "না ভাই, ওটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। বাঘ ছিল না তো ছিলটা কি? ঘরের দাওয়ায় বুড়ি বসেছিল, তাকে থাবা দিয়ে মেরে ফেললই বা কিসে?"

মুদী তার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "বলবে নাকি রাখেশ?" অমনি রাখেশ লাফিয়ে উঠে কর্কশ গলায় চ্যাচাতে লাগল, "ঘাট থেকে চলে এসো তোমরা, নদী পার হয়ে তিন-কোণা আসছে!" সঙ্গে সঙ্গে পিলপিল করে ঘাট থেকে একদল ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে এদিকে ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। গুপি পান্নুকে ফিসফিস করে বলল, "তিন-কোণা মানে হাঙ্গরের তেকোণা পাখনা। এ-সব অঞ্চলে হাঙ্গরে প্রায়ই মানুষদের আধ-খানা নিয়ে চলে যায়।"

ওরা একদৃষ্টে কালো জলের দিকে চেয়ে রইল। তিন কোণা পাল উড়িয়ে ছোট একটা নৌকো এসে ভিড়ল। ওরা অবাক হয়ে দেখল নৌকো থেকে জনা তিনেক মানুষ কয়েকটা বস্তা, হাঁড়ি করে গুড়, আরো কাগজের বাক্সে করে কি-সব জিনিস নামিয়ে মুদীখানার পিছন দিকে চলে গেল। দোকান থেকে ষণ্ডামতো দুজন নৌকোটাকে টেনে ডাঙ্গায় তুলে কাৎ করে রাখল।

দামু দরজার কাছে দেখা দিল, অমরেশ কাকা তাড়াতাড়ি ডটপেন

তুলে উঠতে যাবে, এমন সময় সে কি হিঁয়াও-হিঁয়াও গাঁক-গাঁক চিৎকার। ওদের পিলে চমকে গেল। মনে হল মুদীখানার পিছন থেকেই আসছে। ছোটমামার মুখ কাপড় কাচার দলা সাবানের মতো সাদা হয়ে গেল।

মুদীর বন্ধু রাখেশ বলল, "ঐ দেখ, বাবুদের আত্মাপাখি খাঁচা-ছাড়া! ও মশাই, ওটাও সত্যি বাঘ নয়। সত্যি বাঘ হলে আর আমাদের এখানে ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হত না আর হাঙ্গর ধরে দুবেলা পেট ভরাতে হত না!" মুদী বলল, "তাই। চালটাল পাব কোথায়? ঐ শোলাকচু, শকরকন্দ, হাঙ্গরের মাংস।" বিভূতি বলে লোকটা ছুঁচলো দাঁত বের করে বলল, "তবু একশোবার বলব তার মতো আছেই বা কি? যখন ইয়ে—চালটাল ছিল না, তখন কি আমাদের পূর্বপুরুষরা খেত না! না হে চল, পেটে ভুখ্ লাগছে।" অমরেশ কাকা বললেন, "এক মিনিট। বাঘের সন্ধান যখন পাওয়া গেল না, তোমাদের জীবনযাত্রার কথাই একটু লিখে না নিয়ে গেলে সম্পাদক মশাই আমাকে আস্ত রাখবেন না। একটু বলই না।"

রাখেশ, ভূদেব, কানু একসঙ্গে বলে উঠল, "যাত্রা? না, না, যাত্রা আমাদের কালীপূজোর আগে হয় না।" অমরেশ কাকা একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন, "না না, সেরকম যাত্রার কথা বলছি না, ইয়ে মানে তোমাদের দিন কেমন কাটে। এ-সব অঞ্চলে শুনেছি লোকে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, ছেলেপুলে অনাথ হচ্ছে..."

লোকগুলো সব্বাই বেদম চটে হাত-পা নেড়ে বলতে লাগল, "যাত্রার কথা হচ্ছিল তাই হক না, বাবু, মাখনবাবুর দল..."

অমরেশ কাকা বললেন, "কি মুস্কিল, লেখাপড়া তো আর শিখলে

না তোমরা…”

মুদী বলল, “শিখেই বা কি হত? ধান গাছে শীষ গজাত? বেড়াজালে মাছ পড়ত? রেডিওতে শুনেছি কেউ চাকরিও পায় না…”

“রেডিও? তোমাদের রেডিও আছে নাকি?”

“আছেই তো, মানে ব্লক আপিসের ঘরে আছে, ঐ একই কথা।”

“তাহলে লোকটোকও মরে না?” “তা মরবে না কেন! আমাদের চোদ্দ পুরুষ বেঁচে থাকলেই হয়েছিল আর কি! এই তো গত বছর টিকে না নিয়ে চব্বিশটা লোক ম'ল। টিকে না নিলে মরবে না?”

অমরেশ কাকা খুসি হয়ে খচখচ করে লিখে নিয়ে বলল, “ওদের ছেলেপুলেরা বোধ হয় খেতে পায় না?”

“ও মা! কি বলে! খায় বৈকি! না খেলে তো ওরাও মরা হয়ে যেত!” “ব্লক থেকে দেয় বুঝি?” শুনে ওদের কি হাসি! “ব্লক কোত্থেকে দেবে? তাদের কি পয়সাকড়ি আছে যে দেবে, বাকিতে চুল ছাঁটায়।” বদন বলল, “আহা, সবাই কিছু চুল ছাঁটায় না। ঐ ছোকরাবাবু তো চুল দাড়ি ছাঁটায়ও না, আঁচড়ায়ও না, তেল-ও দেয় না।”

অমরেশ কাকা বললেন, “তবে কে খাওয়ায় ওদের?”

“কে আবার খাওয়াবে? মাইনে কামায়, কিনে খায়।”

“আহা, ওদের কথা বলছি না, ঐ ছেলেপুলেগুলোকে কে খাওয়ায়?”

“সুন্দর রায় ছাড়া আর কে খাওয়াবে?”

অমরেশ কাকা মহা খুসি, “উনি বুঝি এখানকার বড়লোক?”

“তা জানি না বাবু, তবে ঘরে থাকেন না। কিন্তু ওনার দয়া না

পেলে আমরা বনবাদাড়ের মানুষরা কবে উপোস করে, বাঘের পেটে গিয়ে, নির্বংশ হয়ে যেতাম না!"

মুদীর ছোকরা চাকর দামু এসে বলল, "রান্না তৈরি, আসেন, হাত ধোয়ার জল দিই। আগে সুন্দর রায়ের পেসাদ পেয়ে তবে হাত এঁটো করবেন।"

গুপি-পানুর কি আনন্দ। "কি পেসাদ, দামু? বাতাসা নাকি?" দামু বলল, "তবেই হয়েছে! তবেই ওনার পেট ভরল আর কি! ভুট্টার ছাতু, তালের ক্ষীর, গুড়, নারকেল দিয়ে পেসাদ। আগেই আলাদা করে রাখতে হয়, নইলে সব খেয়ে সাবাড় করবেন! চলেন।"

জোড় হাত পেতে ওরা আগে প্রসাদ খেল, খুব ভালো খেতে। তারপর ঘাসের আসনে বসে পানু বলল, "আমরা সুন্দর রায়ের মন্দির দেখেছি, তার মধ্যে ঠাকুর-টাকুর থাকে না।" মুদীর বন্ধুরা ততক্ষণে চলে গেছিল; মুদী বলল, "ঠাকুর থাকে না তো আমার বুড়ি গিন্নি কার সেবা করে? তবে মন্দিরে তাকে দেখা যায় না।"

ছোটমামা এতক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। এবার বললেন, "খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ি ফেরার বোট পাব তো?" শুনে ওরা অবাক, "বোট? কার বোট?" "কেন, ঐ ব্লকের আপিসের বোট।" "ওমা, সে তো সন্ধ্যের আগেই ব্লকের বাবুদের নিয়ে চলে গেছে। কাল সকালে দশটায় আসবে।"

ছোটমামার ভয় দেখে কে! "এ্যাঁ বল কি! তা হলে আমাদের কি হবে? নৌকো-টৌকো···" মুদী বলল, "বাবু, এই জল-ঝড়ে নৌকো-টৌকোর কথা মুখে আনবেননি। আমাদের সব অতিথিরা যেখানে শোয়, সেখেনেই শোবেন। সুন্দর রায়ের মন্দিরে। আপনাদের বিছানা গিন্নি পেতে রেখেছে। দোর এঁটে নিশ্চিন্তে শোবেন। কাল

ভোরে মাছ ধরার নৌকো বেরুলে, আপনাদের পৌঁছে দেবে। ওখানে কেউ থাকে না। তাছাড়া সুন্দর রায় তো···।" এই বলে মুদী থামল।

গরম গরম খিচুড়ি আর ঝাল আলুর দম খেয়ে, মুদীখানার পাশে লাগোয়া, ছোট্ট দোতলা পাথরের মন্দিরের বাইরের সিঁড়ি বেয়ে ওরা ওপরে উঠে, ভিতর থেকে দোর দিয়ে, মাটিতে পরিষ্কার মাদুর ও বালিশে সারা রাত আরামে ঘুমোল। পরদিন সকালে সুন্দর রায়ের চাঁদার বাক্সে খবরের কাগজের আপিসের দেওয়া কুড়ি টাকা ফেলে ওরা মাছ ধরার নৌকো করে রওনা হয়ে গেল। মুদী কিছুতেই কিছু নিল না।

নৌকোয় বসে অমরেশ কাকা বললেন, "ও জায়গায় নদীর স্রোত বোধ হয় বেশি, তা ওপারের বন থেকে জন্তু-জানোয়াররা এদিকে আসে না। দেখ তো কি কুসংস্কার এদের? সুন্দর রায় একটা কাল্পনিক দেবতা, আর তার ওপর বিশ্বাস কত! বলি কেউ চোখে দেখেছে তাকে? আসলে ও গাঁয়ের কেউ কখনো বাঘ দেখেছে কি না সন্দেহ।

গুপি-পানু একসঙ্গে বলে উঠল, "আমরা এক্ষুনি দেখে এলাম। মন্দিরের নিচের তলার ঘরে। এই বড় বাঘ পা মেলে শুয়ে আছে, মিটমিট তাকাচ্ছে। মুদীর গিন্নি দেখাল; বলল, "দোর-গোড়া থেকে নমো কর। উনি ভগবান, দয়া করবেন। বুড়ো হয়ে দাঁতটাত পড়ে গেছে তাই ছাতু প্রসাদ দিই আজকাল। ঝড়খালিতে গিয়ে ওনার বড় কষ্ট হয়েছিল, কোনোমতে পালিয়ে এসেছে। সায়েব কি ধরেছিল সে সাহেবই জানে আর ঠাকুরই জানেন—তবে সে সত্যি বাঘ নয়।"

কুঁদপুরের বাঘ

কলকাতা থেকে রওনা হয়ে কেউ যদি নৌকো করে, আস্তে আস্তে, থামতে থামতে, এই ধর শীতের সময়, কিম্বা শীতের ঠিক আগেই, বা ঠিক পরেই, একেবারে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত যায়, তাহলে তার এমন সব অভিজ্ঞতা হবার সম্ভাবনা আছে, যার ফলে সে আর আগের মানুষ থাকবে না। বড় বড় তীর্থস্থানের কথা বলছি না, সেখানে কেউ বদলায় না। ছোট ছোট জায়গায় যেতে হবে, ডায়মণ্ড হারবার, ফ্রেজারগঞ্জ ছাড়িয়ে যাবার পর। ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত কলকাতার দৌড় তারপর থেকে জায়গাটা বদলাতে শুরু করে।
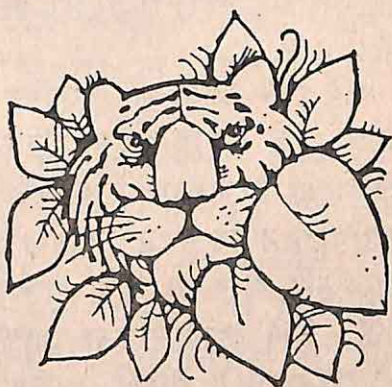
৩০০ বছর আগেও অবিশ্যি কলকাতা পর্যন্ত তার বিস্তার ছিল। চেরাঙ্গীবাবার বনের মধ্যে দিয়ে কালীঘাট যাবার পথে, বাঘ এসে দু-চারটে তীর্থযাত্রী ধরে নিয়ে যেত। গঙ্গাসাগর পৌঁছবার আগেই যদি অন্ধকার হত, তো মাঝ গাঙে নৌকো নোঙর করে রাত কাটাতে হত। নৌকোতে একটা বড় মশাল সারা রাত জ্বলত। বনের জানোয়ার আগুনকে যেমন ভয়

করে, তেমন আর কিছুকে নয়। তবু নাকি একেকটা দুঃসাহসিক বাঘ সাঁতার কেটে, নৌকো থেকে মানুষ টেনে নিয়ে যেত।

আমার পঞ্চুকাকা পোর্ট কমিশনারের লঞ্চে কাজ করতেন, তাঁর কাছে নানান্ রোমাঞ্চকর গল্প শুনতাম। একবার আমাদের পাশের বাড়ির ঠানদিদি এই সব গল্প বলার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে বসলেন, "তা হতে পারে, কিন্তু ওগুলো সত্যি বাঘ নয়। সত্যি বাঘ বেড়ালের মতো। ওরা জল পছন্দ করে না।"

পঞ্চুকাকা বিরক্ত হলেন। "আপনি এত কথা কি করে জানলেন? তাছাড়া সত্যি বাঘ নয়তো কি কেউ বাঘ সেজে আসে নাকি?"

ঠানদিদি বললেন, "কুঁদপুরে আমার বাপের বাড়ি, আমি জানব না কে জানবে বল? কেউ বাঘ সাজে না, বাঘ সাজতে পয়সা লাগে, ওরা কেউ চার পয়সারো মালিক নয়। সাজে না কেউ। বাঘ হয়ে যায়।"

তাই শুনে সকলে খুব হেসেছিল। ঠানদিদি চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "কি, বিশ্বাস হল না বুঝি? কতটুকুই বা জান তোমরা। কুঁদপুরের ছোট ছেলেরাও তার চেয়ে বেশি জানে। আমাদের গাঁয়ে সুন্দর রায়ের মন্দির আছে। হাজার বছরের পুরনো। সুন্দর রায়ের মন্দিরে মূর্তি থাকে না, কিন্তু রোজ পূজো দিতে হয়। তাঁর বেজায় দাপট। তিনি যেমন বাঘদের দেশের মানুষদের দেবতা, তেমনি বাঘদেরো দেবতা। কাজেই সেখানকার মানুষ যে বাঘ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু মানুষের বাঘ হওয়ার চেয়েও ঢের বেশি ভয়াবহ ব্যাপার হল বাঘের মানুষ হওয়া। কারণ তাকে চেনা যায় না। মানুষবাঘ বেজায় বেঘো হয়; কিন্তু বাঘ-মানুষ পরম সাত্ত্বিক হয়।"

বলা বাহুল্য ঠানদিদির কথা শুনে আমরা একেবারে থ! ঠানদিদি বলে চললেন, "আজকাল তোমাদের বৈজ্ঞানিকরা কলের মানুষ বানিয়ে তাদের দিয়ে হিসাব কষিয়ে তোমাদের তাক্ লাগিয়ে দেয়। আমার কিন্তু হাসি পায়। ছোটবেলায় আমাদের গাঁয়ে হামেশাই যা হতে দেখেছি সেসব কথা বললে তোমাদের পিলে চমকে যাবে।"

অমনি সবাই চ্যাঁচাতে লাগল, "বলুন, বলুন।"

ঠানদিদি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলেন।

"মনে থাকে যেন, এ-সব আমার খুব ছোটবেলার কথা, কাজেই কিছু কিছু ভুল-ও হতে পারে। আমাদের পাশের বাড়িতে সুন্দর রায়ের পুরুৎ ঠাকুর থাকতেন। ঐ মাছ-মকরের দেশ, যেখানে রুই-কাতলাকে লোকে নিরামিষ বলে, নালা-নর্দমাতে হাত গলালেই এই বড় বড় বাগদা উঠে আসে, সেইখানে ঐ বুড়ো স্ব-পাকে হবিষ্যি রেঁধে খেতেন। তাঁর একটা ছোট্ট শাকের ক্ষেত ছিল। তিনি নিজে সেটার দেখাশুনো করতেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় পূজো সেরে বাড়ি ফিরছেন, দেখেন একটা বাঘ তাঁর শাকের ক্ষেতে ঢুকেছে! পুরুৎঠাকুরের কিন্তু ব্যাপার বুঝতে বাকি রইল না। অমনি তিনি মশাল-হাতে বাঘের দিকে তেড়ে গেলেন। বাঘ একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই এক দৌড়ে তাঁর গোয়াল ঘরে গিয়ে ঢুকল। গোয়াল ঘরে পুরুৎঠাকুরের বদ্‌মেজাজী বুড়ো বলদ থাকত। পুরুৎঠাকুর অমনি মুচকি হেসে গোয়ালঘরের লোহার আগল তুলে দিয়ে এলেন। তাঁর ঘর নিকোত পদুর বৌ; সে তো কাণ্ড দেখে অবাক। উঠি-পড়ি করে গাঁয়ে গিয়ে খবরটা রটাতে তার বেশি সময় লাগেনি। পরদিন সকালে গোয়ালঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে সবাই দেখে বুড়ো বলদ যেমন ছিল তেমনি আছে;

বাঘ-ফাগ্ কিচ্ছু নেই। পত্নর বৌ গোয়ালঘরের দোর খুলে, গোবর বের করে, ঘর উঠোন নিকিয়ে, পুরুৎঠাকুরের রান্নার কাঠ জড়ো করে রেখে, বাড়ি চলে গেল।

গাঁয়ে গিয়ে শুনল হরু গয়লার ছেলে নাকি পুরুৎঠাকুরের বাড়ি থেকে ছুটো শাক তুলেছিল বলে, পুরুৎ তাকে গোয়ালঘরে বন্ধ করে 'নেই' করে দিয়েছে। হরু গঞ্জে গিয়ে নালিশ করেছে। মামলার দিন গাঁ-সুদ্ধু সব মজা দেখতে গেল। পত্নর বৌ যেচে গিয়ে সাক্ষী দিল যে হরুর ঐ ড্যাক্‌রা ছেলেকে পুরুৎ মোটেই কিছু করেনি, গোয়ালে একটা বাঘকে বন্ধ করেছিল।

হকিম বললেন, "কোথায় সে বাঘ? তাকে দেখাও।" পত্নর বৌ বলল, "সে তো দেখলাম নেই।"

হরু কেঁদে পড়ল, "ঐ তো হল, ধর্মাবতার, আমার ছেলে আর বাঘ কি আলাদা হল নাকি?"

হকিম ছিলেন সায়েব। তিনি মুখ্যু গ্রামের লোকদের কথা শুনে মহা রেগেমেগে, কেস্ বাতিল করে দিলেন। তারপর গাঁয়ের মাতব্বরদের খুব বকাবকি করলেন।—হকিমের সময়ের কি দাম নেই নাকি? আর এই বেচারা ভদ্রলোক, পূজো করে দিন কাটান, এঁকে এমন হেনস্থা করবার মানেটা কি? ঐ হরুকেই সাজা দেওয়া উচিত ছিল। মানুষ কখনো বাঘ হয়? নাকি বাঘ মানুষ হয়? যত সব মুখ্যু কোথাকার—কি হল? পুরুৎঠাকুর হঠাৎ রুখে উঠে; হকিমের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, "ও-ও! মানুষ বাঘ হয় না আর বাঘ মানুষ হয় না, এই তোমার বিদ্যে! গাঁউক!" এই বলে ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে, ল্যাজ তুলিয়ে, এক লাফে বনের দিকে দৌড় দিলেন। আদালতসুদ্ধ সকলে সুন্দর রায়ের জয়ধ্বনি দিল। সেই ইস্তক

পুরুৎঠাকুরকে আর কেউ চোখে দেখেনি। আজ পর্যন্ত কুঁদপুরের সুন্দর রায়ের মন্দিরে কোনো পুরুৎ-টুরুৎ নেই। গাঁয়ের লোকে মন্দিরে রোজ দুবেলা প্রদীপ জ্বেলে ফল-ফুল দিয়ে আসে। সুন্দর রায়ের দেশ ওটা; কে বাঘ কে মানুষ কে বলতে পারে? আজকাল নাকি আবার বাঘের চাষ হচ্ছে। শুনলেও হাসি পায়।"

এই বলে ঠানদিদি উঠে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পঞ্চুকাকা বললেন, "তাহলে হরু-গয়লার ছেলের কি হল?" "কি আবার হবে? তার-পরেই একটা চুরির কেস! আসামীকে হাজির করতেই সকলে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে হরুর ছেলে ভুটে! ব্যাটা এদ্দিন হাজতে ছিল তাহলে!"

পঞ্চুকাকা ছাড়েন না, "তাহলে গোয়ালের বাঘটার কি হল?" "আরে সেটা কি সত্যি বাঘ ছিল নাকি? পদুর বৌয়ের বরটা নারকেল চুরির হাঙ্গামায় পড়ে গেলে, তার-ও তো একটা গা-ঢাকা দেবার উপায় থাকা চাই।" এই বলে ঠানদিদি সত্যি সত্যি চলে গেলেন।

পঞ্চুকাকাও উঠে পড়ে বললেন, "যত সব গাঁজাখুরি গল্প। তবে ও-সব জায়গায় যে অসম্ভব ঘটনা ঘটাও সম্ভব, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

শেষরাতে

ন্যালা, খ্যাপা, মধু, বিধু, ভুটো, জাপু, ট্যারা, ন্যাড়া—আটজনে চলেছে পৌষ মাসের শেষরাতে পাদ্রী-সায়েবদের খেজুর-গাছের রস খেতে। শীতের চোটে সারা গায়ে কাঁপুনি ধরে। কেউ গায়ে জড়িয়েছে

ছেঁড়া চটের থলি, তাতে আলুর গন্ধ মাটির গন্ধ মাখা। কেউ জড়িয়েছে পুরনো খবরের কাগজ, মধ্যিখানে মুণ্ডু গলাবার জন্য একটা বড় ছ্যাঁদা করে। চলতে গেলে ধকড়-পকড় আওয়াজ দেয়।

এবার গুটি কতক নলনলে দেখে, শক্ত-পোক্ত পেঁপের বোঁটা পেলেই হয়ে গেল। পাওয়াও গেল এক গোছা, হারু মোড়লের পেয়ারের পেয়ারা-বাগানের ধার থেকে।

ন্যালা বলল, "এক্ষুনি পূবে ফরসা দেবে, চলে চল্, চলে চল্!" খ্যাপাও পাখি-পড়ার মতো বলতে লাগল, "পা-চালা! পা-চালা!"

এমন সময় শেষরাতের মিশকালো ভুস্কো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ও কি! খটাখট্! ঝিন্ঝিন্, ঝন্ঝন্ ফোঁশফোঁশ!

ই কি! এই শীতের শেষ রাতে কে আবার ঘোড়ায় চাপে? আর শুধু ঘোড়াই নয়, মেটে রাস্তায় ও কিসের ঘসর-ঘসর মসর-মসর আওয়াজ দিচ্ছে—যেন মাটির ওপর ভারি চাকা ফস্কে ফস্কে যাচ্ছে!

মেটে পথটি ঠিক ঐখানে একটা বঠ কি দিয়ে, ঢালু হয়ে অনেকখানি নেমে গেছে। আর তারি দুধারে বেলের গাছ, শ্যাওড়া-গাছ, কেয়া-ঝোপ, বাঁশ-ঝাড় ঘুপসি অন্ধকার বানিয়ে রেখেছে। চট্ করে আটজনে তারি মধ্যে বেমালুম মিলিয়ে গেল।

ভুটো জাপুর কানে-কানে বলল, "এ জায়গাটা ভালো নয়।

মোগ্‌লাই কবর আছে। মাম্‌দো থাকে!" শুনে জাপুর হয়ে গেল! হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি দূর থেকে শোনা গেল।

প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে মধু বলল, "ওরে নেলো, কি হবে! তাছাড়া বড়কর্তা নাকি আজ পর্যন্ত শীতের ভোরে ঘোড়ায় চেপে রস খেতে যান। দেড়শো বছরেও তাঁর তেষ্টা মেটেনি—ই-ই-ই-ক্!" ন্যালা ওর মুখ চেপে ধরেছিল, "চোপ্! শুনতে পাবে। বোধ হয় বড়লোক। মোটা।"

মোটা শুনে সবাই চোখ পাকিয়ে, মুখ ছুঁচলো করে, অন্ধকার ফুঁড়ে, দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। রাস্তার উঁচু জায়গাটা থেকে ঘোড়ার মুণ্ডু নাড়ার লড়ঝড়, কান পত্‌পত্‌ আর শেকলের ঘন্টির টুংটাং কানে এল। সবার গায়ের লোম খাড়া।

এমন সময় নিবন্ত তারার শেষ আলোয় তাকে একবার দেখা গেল। বড়লোক বটে। মোটাসোটা, মাথায় টুপি, পরনে মাটি অবধি ঝোলা জাব্বাজোব্বা, পায়ে মিলিংটারি বুট্। ঘপর-ঘপর করে কাঁচা মাটির পথের ওপর দিয়ে চলেছে। বোধ হয় রোজ দু-বেলা পেট ভরে রান্না ভাত খায়। হয়তো হাঁসের ডিম-ও খায়। নইলে অমন গা-গতর হয় কখনো!

কিন্তু বড়লোক নয়। পিঠে মস্ত বোঁচকা। শরীলটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ধোপাটোপা নয়তো, ভাটি থেকে কাপড় নিয়ে ফিরছে? মনটা হতাশ হয়ে গেল। তাহলে কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। এদের ট্যাঁকে কিছু থাকে নাকি যে দেবে? ইচ্ছে থাকলেও দিতে পারে না। ইচ্ছেও হয় না। অন্যদের যদি বা দেয়, এদের দেবে না। যত সব নোংরা বদ্ ছেলে!

এমন সময় একটা বড় তারা টুপ করে পশ্চিমে ডুবে গেল। সেই

আলোটুকুতে আটজনে স্পষ্ট দেখতে পেল রাস্তার উঁচু বাঁকে যে-ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথায় ডালপালাওয়ালা এক জোড়া মস্ত শিং আর বুড়োর মুখে সাদা দাড়ি হাঁটুর নিচে ঝুলে আছে!

সঙ্গে সঙ্গে ন্যাড়া ট্যারা চেঁচিয়ে উঠল, "চিনেছি! চিনেছি! ও-ই তো বাবা বড়দিন! ঝোলা ভরে ভালো ভালো জিনিস নিয়ে যাচ্ছে পাদ্‌রিদের দেবে বলে! ধর! ধর!"

এ্যা, চেনা লোক? তবে তো আর ভয় নেই! ধর-ধর!

বুড়ো-ও কিছু কম যায় না। যেই না পেছনে একটা হৈ-চৈ কানে গেছে, অমনি আর কথাটি নেই, জোব্বাটি হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়ে পাঁই-পাঁই দে ছুট! ঐ সাদা দাড়ি কাঠ-বুড়োর এলেম দেখে এরা আটজন থ'! সেই ফাঁকে বুড়ো আরো হাত পঞ্চাশ এগিয়ে গেল।

ওরাও ধুপধাপ এলোপাথাড়ি দৌড়চ্ছে। এখনি ধরতে না পারলে আর পারা যাবে না। ঐ যেখানে আকাশের অন্ধকার আর ড্যাঙার অন্ধকার মিলেছে, সেখানে পাদ্রীদের সাদা আস্তানা অন্ধকারেও মালুম দিচ্ছে। ছুঁচ্‌লো চূড়ো ছোট গির্জে, তার পাশে পাদ্রীদের ঘর, তার পাশে ছুতোরের কারখানা, তার পাশে মা-বাপ-মরাদের অনাথ আশ্রম! ওখানে পৌঁছতে পারলে, লাঠি-সোঁটা নিয়ে ষণ্ডা ষণ্ডা অনাথগুলো তড়বড়িয়ে ছুটে আসবে। তাদের সঙ্গে এরা পারবে কেন?

এদের মধ্যে সবচেয়ে তুরন্ত যে ন্যালা, খ্যাপা, ওরা তুজন ছিল ওখানে প্রায় তু-বচ্ছর। এ-পি-সি-টি শিখেছে ওরা, পড়তে পারে। চেয়ার টেবিল ডুলি টুল বানাতে শেখায়। পাকা শালকাঠ দিয়ে। জুতো সেলাই শেখায়—নতুন জুতো না, ছেঁড়া পুরনো জুতো। বই বাঁধাই শেখায়—ছেঁড়াখোঁড়া পাতা আল্‌গা বই নতুনের মতো হয়ে যায়। বুড়ো ফাদার বলে—ভকপানের দোয়ায় নিজের হাতে খেটে

খাবে, কারো কাছে হাত পাতবে না।

অত পোষায়নি ন্যালা খ্যাপার। খেটেই যদি খাবে তো ভকপানের দোয়া আবার কিসের ? না রে বাবা, অত খাটুনি সহ্য হয় না। এক দিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে, সেই যে দুজন টেনে দৌড় দিল, একেবারে অজয় নদীর ধারে গিয়ে থামল। তবে খেতে দিত ভালো। সকালে রোজ আখের গুড় দিয়ে আটার রুটি, দুপুরে রোজ গরম ভাত দিয়ে ডাল দিয়ে কুচো মাছের ঝাল ! আহা, রাতে আবার ঘ্যাট হত, মুখি কচু পোড়া মাখত কাঁচালংকা দিয়ে। রাতে বড় ঘরে চাটাই পেতে আরামে শুত সবাই। কিন্তু বাইরে থেকে দরজার ছিক্লি তুলে দিত। নাকি, তা না হলে তিন গাঁয়ের লোকের কারো কিছু হারালে অমনি বলে বসত, ঐ ফাদারদের ছেলেদের কীর্তি ! কাঁচা আম খাওয়া নেই, নস খাওয়া নেই, কিচ্ছু না। না পালিয়ে করে কি ? প্রতি বছর বড়দিনের ভোর হবার আগে স্বর্গ থেকে লক্ষী-ছেলেদের জন্যে কাপড়চোপড়, খেলনা, ভালো ভালো খাবার এইসব পুঁটলির মধ্যে বেঁধে, শিংওলা হরিণ-টানা গাড়ি চেপে, বাবা বড়দিন আসে। দুষ্টুদের কিচ্ছু দেয় না। সে বার কিচ্ছু পায়নি ন্যালা খ্যাপা। আজ দেখে নেবে।

বাকি ছয়জন অবাক হয়ে দেখল ন্যালা খ্যাপা দল ছেড়ে বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সাহস তো কম নয়। কিন্তু কেন গেল ?

কেন তা একটু বাদেই বোঝা গেল, যখন "মাই ঘট্ ! মাই ঘট্ !" বলে হাত-পা এলিয়ে বুড়ো প'ল ! পুঁটলি গেল ছেত্রে, জিনিসপত্র ছয়-লাপ ! ছুটে গেল মধু বিধু ন্যাড়া ট্যারা ভুটো জাপু। আহা আহা ! লাগল নাকি ! ইস্, নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে !

ভুটো তার ছ্যাচা বাঁশের মশালটা জ্বেলে নিতেই, বুড়োকে তুলে

সবার আক্কেল গুড়ুম! বুড়ো তো নয় লালমুখো সায়েব যে! ন্যালা-খ্যাপা যেমন বলেছিল হুবহু তাই। আছাড় খেয়েও নীল চোখ মিটি-মিটি হাসছে। হ'ত দিশী হাড়, ঠ্যাং যেত মটকে।

কিন্তু লেগেছিল বুড়োর। দাঁড়াতে পারছিল না, ঠ্যাং মুড়ে মুড়ে পড়ে যাচ্ছিল; একে ধরছিল, ওকে ধরছিল। কপালে কেটে গেছিল। ওরে ন্যালা, ওরে খ্যাপা, এমন কাজও করে! ঠেকা দে, ঠেকা দে! ব্যথা বড় পাজি জিনিস। অন্ধকারে হাতড়ে গ্যাঁদাফুলের পাতা ছেঁচে কাটা ঘায়ে লাগালে, তবে রক্ত পড়া থামল। উঃফ্! বাঁচা গেল। ন্যালা-খ্যাপাকে কষে দুই গাঁট্টা দিল ভুটো। আর লোক পেল না। সাদা দাড়ি ঐ কাঠ-বুড়ো, মা-বাপ-মরাদের জন্য পুঁট্‌লি বেঁধে জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, তার পায়ের ফাঁকে বাঁশের ডগা গুঁজে চিৎ করে ফেললি! ছিঃ ছিঃ!

ন্যালা বলল, "পুঁটলি থেকে পাঁউরুটির গন্ধ বেরুচ্ছে!" মধু ঢোক গিলে বলল, "বেরুক। তোর তাতে কি। জিনিসগুলো কুড়িয়ে এনে আবার বেঁধে দে।"

গরম সোয়েটার, রবারের চটি, লাল বল কাঠের ব্যাট, নতুন না হোক, একেবারে আস্ত! ছবিওলা সত্যিকার বই! থলি ভরা ল্যাবেঞ্চুষ, কাটবোর্টের বাক্স ভরা লাল চিনি মাখানো বিস্কুট।

বিধু বলল, "এ-সব কখনো সত্যি হয়? অশরিলীদের কাজ। তার ওপর বাঁশবনে গিয়ে সরু ডাল কেটে এনেছিস্! চলে আয়, চলে আয়! লম্বা দে! আর থাকা নয়—ই-ই-ই-ক্!"

ধরেছে বুড়ো দুহাতে দুটোকে চেপে। ঐ ন্যালা আর খ্যাপাকে! বাকিগুলো দে পিট্টান!

পুঁটলি খুলে বুড়ো ওদের কোল ভরে কাপড়চোপড়, খাবারদাবার,

খেলনা দিয়ে, ভাঙা ভাঙা ভাষায় বলল, "গোড়া-গাড়িঠো লে আও, বেটা!" কিন্তু আনবে আবার কি! গাড়িটা রয়েছে, ঘোড়াটা কোথায় পালিয়েছে! স্বর্গ থেকে নেমে এসে বড়দিনের বুড়ো কি শেষে আতান্তরে পড়বে?

খালি গাড়ি টেনে নিয়ে এল হ্যালা। বুড়োকে তার পুঁটলি সুদ্ধু তুলে, দুজনে মিলে ঠেলেঠুলে ভোরের আগে গির্জার খিড়কি দোরে পৌঁছে দিয়ে এল।

সেদিন অজয়ের ধারের তিন গাঁয়ের লোকে একটা লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়াকে ঘুরে বেড়াতে দেখে অবাক হয়ে গেল। সেটার মাথায় আবার এক জোড়া হরিণের শিং বাঁধা!

বাঘ! বাঘ!

প্রায় একশো বছর আগেকার গল্প, সেই দারজিলিং-এর রেলের লাইন বসাবার সময়কার কথা। জানই তো প্রথম দল গাছপালা কেটে, মজবুত করে পথ বেঁধে দিয়ে, এগিয়ে গিয়ে নতুন জায়গায় ক্যাম্প করত আর দু' নম্বর দল এসে পুরনো ক্যাম্পে উঠে, বাঁধা পথে লাইন বসাত।

একবার গাছ কেটে পথ বাঁধানো হয়ে গেছে, অথচ দু' নম্বর দল খানিকটা পেছিয়ে পড়েছে, কাজেই প্রথম দল একটু বিশ্রাম করবার সময় পেয়েছিল।

এমন সময় বনের ভিতরকার গাঁ থেকে একদল লোক এসে

সাহেবকে বলল, "সাহেব, একটা বাঘের জ্বালায় আমরা টিকতে পারছি না। সেটাকে মেরে দাও।" সাহেব বলল, "কেন, বাঘ কি করে? মানুষ খায়?" "না সাহেব, চিতা-বাঘ কি আর মানুষ খাবে? তবে হাঁস-মুরগি, ছাগল, ভেড়া, বাছুর, কিছু রাখবার জো নেই। বাঘটা মেরে দাও। যত লোক লাগবে, আমরা দেব।"

সাহেব-ও খেটে খেটে হয়রান হয়েছিল, অমনি রাজী হয়ে গেল। ঠিক হল বন পিটিয়ে বাঘ বের করা হবে। বনের এক ধার থেকে টিন, ক্যানেস্তারা, ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, কাঁসি পিটিয়ে কান-ফাটানো শব্দ করতে করতে এক দল গোল হয়ে এগোতে থাকবে। ভয় পেয়ে বনের সব জানোয়ার সামনের দিকে ছুটবে। বন শেষ হবার আগে বন্দুক নিয়ে শিকারীরা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে আর পটাপট জানোয়ার মারবে। এবার বাঘমশাই না বেরিয়ে পারবে না।

সাহেব তাঁর হিসাব-বাবুকে খুব ভালোবাসতেন, তাকে পাশে নিয়ে বন্দুক হাতে সারা দিন ঝাঁপে খাড়া রইলেন। ওদিকে হুশো গ্রামবাসী গোটা বন পিটিয়ে শত শত হরিণ, শুয়োর, খরগোশ, বেজি, বহু পাখি ও যাকে বলা যায় নিরামিষ ধরনের জানোয়ার বের করে আনল। তার মধ্যে অনেক মারাও হল। কিন্তু আমিষ ধরনের জানোয়ারের মধ্যে চারটে শেয়াল ছাড়া কিচ্ছু বেরুল না। বাঘ তো

নয়ই, বন-বেড়ালও নয়। সবাই অবাক হল, তাহলে বাঘটা গেল কোথায় ?

সন্ধ্যার আগে গাঁয়ের মোড়ল এসে বলল, "আর কেন ? এবার ছাড়ান দিন, সাহেব। ও-বাঘ নিশ্চয় সে-দিন আমাদের কথা শুনে পিট্টান দিয়েছে। ওরা যে মানুষের কথা বোঝে, এর আগেও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। ওরা রাতারাতি চল্লিশ মাইল দূরে চলে যেতে পারে। গাঁয়ের লোকরা শুয়োর হরিণ খেতে পেয়ে খুসি হয়ে যাবে। আপনার লোকরাও কিছু ভালো মাংস পেলে রাগ করবে না।"

শেষটা সাহেব রাজী হলেন। আর দেরি করা যায় না, কাল থেকে নতুন জায়গায় কাজ শুরু হবে। তখন সাহেব হতাশ হয়ে হিসাব-বাবুকে চাবি দিয়ে বললেন, "তুমি পুরনো ক্যাম্পে ফিরে রাতটা সেখানে থাক। আমরা নতুন ক্যাম্পে যাই। কাল সকালে দু' নম্বর দল এসে পোঁছলে, তুমিও চলে এসো। পুরনো ক্যাম্পে একটা হরিণ পাঠানো হচ্ছে।"

হিসাব-বাবু পুরনো ক্যাম্পে ফিরে হরিণ রান্নার তোড়জোড়ে মেতে গেল। অনেক রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর, নিজের তাঁবুতে ঢুকে, আবছায়াতে দেখে, ওর খাটে কে একজন আরাম করে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একটু একটু নাক ডাকার শব্দ আসছে। আর ঘরময় সে কি বোঁটকা গন্ধ! এদেশের লোকরা তো আর স্নানটান করে না।

রাগের চোটে হিসাব-বাবুর গা জ্বলে গেল। অমনি তাঁবুর বাইরে রাখা বাল্‌তি তুলে হু-স্‌ করে ঠাণ্ডা জল দিয়েছেন ঢেলে ঘুমন্ত লোকটার ওপর! সে লোকটাও আঁৎকে উঠে, 'ঘেঁউক্‌!' করে বিকট শব্দ করে, তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে দে ছুট! হিসাব-বাবু ভালো করে তাকে দেখতে পেলেন না, শুধু তারার আলোয় চোখে পড়ল হলদের ওপর কালো চকড়া-বকড়া দাগ কাটা এই লম্বা এক ল্যাজ।

হিসাব-বাবু এতক্ষণে টের পেলেন সারা দিন বাঘ কোথায় ছিল! তখন হাঁটু দুটো হঠাৎ নরম হয়ে যাওয়াতে, ধপ্‌ করে তিনি পাথরের ওপর বসে পড়লেন। খালাসীরা খানিক বাদে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তাঁর মাথায় জল ঢেলে, তাঁকে অন্য তাঁবুতে তুলল।

সব চাইতে ভালো

বাড়ির মধ্যে সব চাইতে ভালো ঘর ছিল ঐ কাঠ-গুদোমটি। পূব দিকে তার বড় বড় জানলা, তাতে গরাদ দেওয়া, কিন্তু পাল্লা নেই। ছিল এক সময়; দু' বছর আগে বাবার যখন পা ভাঙে, তখন অনেক টাকায় সব জানলা বেচে দেওয়া হয়েছিল। এখন সূর্য যেই পাহাড়ের মাথার ওপর ওঠে, রোদ এসে ঘরে ঢোকে। দুপুরে ঘরের ছাদটুকু ডিঙিয়ে তিনটে থেকে আবার পশ্চিমের জানলা দিয়ে ঢোকে। বলিনি সব চাইতে ভালো ঘর!

আবার ঐ সব চাইতে ভালো ঘরের মধ্যে সব চাইতে ভালো জিনিসটি হল বুড়ো-দাদুর ঠাকুরদাদার ভাঙা পাখি-ঘড়িটি। সেটি

কাঠ-গুদোমে রাখা গত পঁচাত্তর বছর ধরে সব কাজ-ফুরিয়ে-যাওয়া, ফেলে-দেওয়া জিনিসের সঙ্গে কাঠ-গুদোমের যে-কোণটিতে বিকেলে আধ ঘণ্টা ছাড়া না আসে রোদ, না আসে কুয়াশা—সেখানকার দেয়ালে ঝোলানো থাকে। চলে না। নাকি পঞ্চাশ বছরের বেশি হয়ে গেল থেমে গিয়ে, বারোটা বেজেছে তো সেই বারোটাই বেজে আছে।

চারকোণা খুদে ঘরের মতো ঘড়ি। মধ্যিখানে ঘড়ির মুখ, তারি ওপরে ছোট্ট বারান্দা আর দুদিকে দুই দরজা। আগে নাকি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক দিকের দরজা দিয়ে চুণিমণি একটা পাখি বেরিয়ে, যতটা বেজেছে, কুক্-কুক্ করে ততটা ডাক দিয়ে, আবার ঝপ্ করে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকে যেত। এখন সে ঘড়িও চলে না, পাখিও আসে না। তা চৌরাস্তায় যে পুরনো জিনিসের দোকান আছে, সেখান থেকে হবিব মল্লিক নিজে এসে এক সত্যিকার লালমুখো সাহেবকে ঘড়িটে দেখালেন। সায়েব তাঁর ঠাকুরদার পাখি-ঘড়ি দেখতে চায় শুনে বুড়ো-দাদু আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু দু' হাজার টাকা দিয়ে সায়েব ভাঙা ঘড়ি কিনতে চায় শুনে বুড়ো রেগে চতুর্ভুজ। "কি! আমার ঠাকুর-দাদাকে দেওয়া স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুরের কেনা জিনিস পয়সা দিয়ে কিনতে চায়! ও-সব হবে-টবে না।"
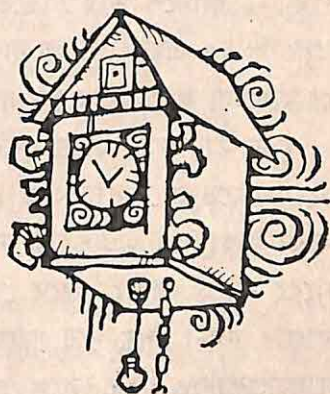
হবিব মল্লিক বোধ হয় সায়েবকে অনেক আশা দিয়ে নিয়ে এসে-

ছিলেন, নিজেরো হয়তো কিছু লাভের আশা ছিল, তাই তিনিও সহজে ছাড়তে চান না। ভয়ে তিন হাত পেছিয়ে গিয়ে, সায়েবের আড়াল থেকে বললেন, "এঁরা যথেষ্ট বড়লোক, পাঁচ-সাতশো কি হাজার টাকা বেশি দিতেও আপত্তি নেই। ঐ রকম ঘড়ি পৃথিবীতে আর খুব বেশি নেই, তাই—"

বুড়ো-দাদু রেগে বললেন, "খুব বেশি মানে? আর একটিও নেই এ-রকম। দ্বারকানাথ ঠাকুর দোকানের তৈরি ঘড়ি কিনবার মানুষ ছিলেন না। এটা ফরমায়েস দিয়ে করা। তোমরা যতখানি দেখতে পাচ্ছ, এ আসলে তার চাইতেও অনেক বেশি আশ্চর্য ঘড়ি। লাখ টাকা দিয়েও এমন ঘড়ি হয় না। দশ লাখ দিলেও আমি বেচব না। এর মধ্যে যা আছে তার তুলনা হয় না।"

বুড়ো-ঠাকুরদার ফরসা মুখটা অস্বাভাবিক রকম লাল হয়ে গেছে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সায়েবকে নিয়ে হবিব মল্লিক চলে গেলেন। তবে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে শহরে নেমে গেলেন না। ছেলে-মেয়েরা বুঝল মায়ের কাছে দরবার করতে গেছেন। বুড়ো-দাদু মুখে ভাঙা আল-বোলার নলটা দিয়ে দূরে বরফের পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলেন। আলবোলাটাও একটা ফেলে-দেওয়া জিনিস। অন্যান্য আসবাবের সঙ্গে এই ঘরেই থাকে। আগে কলকে বসিয়ে ওটা ধরানো হত, তারপর পাঁচ বছর হতে চলল তামাকের ধোঁয়া মুখে গেলেই কাশি আসে, তাই সাধের আলবোলাটি ছাড়তে হল।

মা সেটাকে ওঁর চোখের সামনে থেকে সরিয়ে অন্য সব বাতিল করা জিনিসের সঙ্গে এই কাঠ-গুদোমে রেখে দিয়েছেন। তা বুড়ো-দাদুও সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে বসে থাকেন, কলকে-নেই ভাঙা-আল-বোলার নলটি মুখে দিয়ে, হাতল-ভাঙা রঙ-চটা দোলা-চেয়ারে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সায়েবকে নিয়ে হাসিমুখে হবিব মল্লিক নেমে যাচ্ছেন। মা কি বলেছেন কে জানে। ছুপুরে গরম খিচুড়ি আর ছোট্ট ছোট্ট নতুন আলুর দম সকলের পাতে দিয়ে মা বললেন, "হাজার তিনেক টাকা হলে কলকাতায় গিয়ে তোদের বাবার পায়ের হাড়ে পিন লাগিয়ে জোড়া দেবার ব্যবস্থা হয়। তবেই আবার হাঁটতে পারবেন। তবেই আবার কাজে যোগ দিতে পারবেন। আবার পুরো মাইনে পাবেন। এখন তো অর্ধেক দিচ্ছে। আসছে মাস থেকে তাও বন্ধ হয়ে যাবে।"

ছেলেমেয়েরা যে যার প্লেটের দিকে চেয়ে রইল। বুড়ো-দাছু বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুমিও তো স্কুলে পড়াও, মাইনে পাও।" মা আস্তে আস্তে বললেন, "ছুশো টাকায় কতটুকু হয়, দাছু?" বুড়ো-দাছু বললেন, "বেশ আমার পেনশান্টাও না হয় তোমাকে দেব।"

মা বললেন, "সে তো মোটে একশো টাকা।" ততক্ষণে বুড়ো-দাছুর খাওয়া শেষ হয়ে গেছিল। তিনি রেগেমেগে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে বললেন, "অত টাকা-টাকা করিস্‌নে, নাত-বৌ, টাকা বড় নোংরা জিনিস।" এই বলে ছুপ-ছুপ করে, পশ্চিমের জানলা দিয়ে রোদ ঢুকবার আগেই বুড়ো-দাছু কাঠ-গুদোমে গিয়ে উঠলেন। এরাও তাঁর সঙ্গে গেল। যে-কথাগুলো বলা হল না, কারো সেগুলো বুঝতে বাকি রইল না। মা আসলে বলতে চাইছিলেন, ঘড়ির জন্য সায়েব তিন হাজার টাকা দিতে চায়। তাই দিয়ে কলকাতায় গিয়ে বাবার পা-টা জোড়া লাগানো যায়। তাহলে আর তাঁকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয় না। উঠে হেঁটে আপিস যেতে পারবেন। আর বুড়ো-দাছু আসলে বলতে চান, "ও-সব বলে আমার মেজাজ বিগড়ে দিও না। ও-ঘড়ি আমি কিছুতেই বেচব না।"

ছেলে-মেয়েরা কেউ কিছু বলছে না দেখে আবার বললেন, "ও কি যে-সে ঘড়ি ভেবেছিস্? এই বাড়িটার মধ্যে যেমন এই ঘরটা সব চাইতে ভালো, তেমনি এই ঘরের সব জিনিসের মধ্যে ঐ ঘড়িটা হল সব চাইতে ভালো জিনিস। ওর মধ্যে যা আছে তার তুলনা নেই।"

তবু কেউ কিছু বলল না। বুড়ো-দাদু বললেন, "ওটা জাদু-ঘড়ি।" ছেলে-মেয়েরা অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই, বুড়ো-দাদু বললেন, "পঞ্চাশ বছর ধরে যে-ঘড়ি বন্ধ, আজকে চাপড় মারলেই সে তবে চিপ্-চিপ্ করবে কেন? বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখতে পারিস্।"

অমনি নেপু উঠে দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ির পাশে বেশ জোরে জোরে দুটো চাপড় মারল। ঘড়ি দুলে উঠল। কিছুটা ধুলো আর ঝুল মাটিতে খসে পড়ল আর ঘড়ির ভিতর থেকে পঞ্চাশ বছর চুপ করে থাকা পাখি বলল চিপ্-চিপ্। শুনে সকলে হাঁ।

বুড়ো-দাদু বেজায় খুসি হয়ে বললেন, "বলিনি তোদের জাদু-ঘড়ি। পঞ্চাশ বছরের বোবা পাখি বিক্রি হবার নাম শুনেই চিপ্-চিপ্ করছে। নাতবৌ বলে কি না টাকা চাই! আরে বাপু ঘড়ি না বেচে, যে দিন ঘড়ি বন্ধ হল সেই দিন-ই হারানো আমার ঠাকুমার হীরের আংটিটেই নয় খুঁজে বের করে নে। তার দাম নাকি পাঁচ হাজার টাকা! বাবা বেচতে চেয়েছিল, তা ঠাকুমার হাত থেকে কোথায় খসে পড়ে হারিয়ে গেল।"

সবাই চুপ করে রইল। তিনটে বাজলে বুড়ো-দাদু তাঁর দুধ-সাবু খেতে উঠে গেলেন। তারপরেই পাশের বাড়ি থেকে হারুবাবু আসবেন। রান্নাঘরের উঁচু উনুনের পাশে আরামে গরমে বসে দাবা খেলা হবে। এ-বেলা আর ওঁরা কেউ কাঠ-গুদোমে আসবেন না। গুপী বলল, "নেপু, পাখি তাহলে মরেনি। তোর স্ক্রুপ্‌ডাইবার আর

প্লাস্ এনে খুদে ঘরের ছাদ খুলে ফেলে ছাখ দিকিনি ভেতরে কি ব্যাপার। নাকি তার তুলনা নেই!”

ওদের মধ্যে গুনী সবার বড়, তার কথায় বাকিরা ওঠে-বসে। নেপু হাতিয়ারগুলো এনে ভাঙা চেয়ারে চড়ে অমনি ঘড়ি-ঘরের চাল তুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে চিপ্-চিপ্-চিপ্-চিপ্ করে পাখিটে ডেকে উঠল। সবাই যে যেখানে পারল চড়ে পড়ে ঘড়ির মধ্যে তাকিয়ে দেখল। পশ্চিমের জানলা থেকে কেমন করে এক ফালি রোদ এসে ঘড়ির মধ্যে পড়ল। ঘড়ির মধ্যে যা দেখল, তাতে সবাই মিলে এমনি কলকল করে উঠল যে বুড়ো-দাহু আর হারুবাবু দাবা খেলা ফেলে, মা ইস্টু রাঁধা নামিয়ে, একসঙ্গে ছুটে এলেন। মা উঠলেন তে-ঠেঙা টুলে, বুড়ো-দাহু আর হারুবাবু এ ওকে খামচাখামচি করে জানলার ওপর।

যা দেখা গেল তাতে সবাই থ’। ঘড়ি-ঘরের আসল পাখিকে তার জায়গা থেকে ঠেলে ফেলে, খুদে এক পাহাড়ি টুনটুনি, তার সবুজ রঙের পিঠ, হলুদ রঙের গা, ভাঙা রিক্শার ছেঁড়া গদী থেকে এই এত্তটুকু তুলো বের করে বাসায় তাপ্পি দেবার জোগাড় করছে! পাখি তার কালো চোখ দিয়ে এত্তগুলো বিলবিলে চোখ দেখে চিপ্ বলে একবার ডেকে, প্রজাপতির ডানার চাইতে ছোট ডানা হুটি একবার ঝাপটে, ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। পড়ে রইল, হারানো হীরের আংটি না, কিচ্ছু না, খালি মুক্তোর মতো ছোট্ট ছোট্ট হুটি ডিম আর পুরনো পাখির পিঠে গোঁজা হলুদ হয়ে যাওয়া এক পোস্ট-কার্ট। তাতে ইংরিজিতে লেখা—প্রিয় কুমুদ, এই ঘড়ি তোমাকে ভালোবাসার সঙ্গে দিলাম। ইতি— ডি এন্ টি। বুড়ো-দাহু বললেন, “ডি এন্ টি যে কে সে আশা করি কাউকে বলে দিতে হবে না।” তারপর ডিম হুটিকে

দেখিয়ে বললেন, "বলিনি, সবার চাইতে ভালো ঘর এটি, এ-ঘরের সবার চাইতে ভালো জিনিস ঐ ঘড়ি, ঐ ঘড়ির মধ্যে সবার চাইতে ভালো জিনিস ঐ ছুটি মুক্তোর মতো ডিম। ওর কি কোনো তুলনা আছে?"

গুণী ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, "কিন্তু হীরের আংটি না পেলে যে সেটি বেচে টাকা পাওয়া যাবে না, বাবার পায়ে পিন্ লাগানো হবে না, বাবা হাঁটতে পারবে না—" অমনি বাকি তিনটেতে এমনি চ্যাঁ-ভ্যাঁ লাগাল যে বুড়ো-দাছু কানে হাত চাপা দিয়ে রেগে বললেন, "কি জ্বালা! থাম্‌বি কি না বল! ঐ মুক্তো ছুটি ফুটে পরীদের মেয়ের মতো ছুটি পাখি বেরিয়ে উড়ে গেলেই তো ঘড়ি বেচাতে কোনো বাধা থাকবে না। তা ছাড়া আংটি কোত্থেকে পাবি? ও কি সত্যি ছিল? ও আমি তোদের মন ভালো করবার জন্য বানিয়ে বলতাম। যা গে হবিবকে বলে আয়। ঐ শোন্ ঘড়িটাও চলতে লেগেছে!"

বাস্তবিকই তাই। পোস্ট-কার্ট বের করে নিতেই ঘড়ি চলতে শুরু করে দিয়েছিল! ঐ পাখির ছানারা ডানা গজিয়ে, উড়ে গেলেই সায়েব ঐ ঘড়ি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিল। আর সেই হলদে হয়ে যাওয়া পোস্ট-কার্ট কোন্ সংগ্রহশালা এক হাজার দিয়ে নিয়ে নিয়েছিল। বাবার পা সারানো হল; বাবা আবার অপিসে গেল; মায়ের মুখে হাসি ফুটল; আর বুড়ো-দাছু কাঠ-গুদোমটাকে আগা-গোড়া মেরামত করে, সব জানলায় সার্সি লাগিয়ে, সব ভাঙা চেয়ার টেবিল টুলে নতুন ঠ্যাং লাগিয়ে একাকার কাণ্ড করে ফেললেন। সব চাইতে মজা হল হবিব একটা চমৎকার পুরনো দেয়াল-ঘড়ি উপহার দিয়ে গেল, তাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় টুং টাং করে বিলিতী গৎ বাজে।

দুই মা

ভারতের তথ্য ও বেতার বিভাগের কর্মীদের যে নানা রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হওয়াই স্বাভাবিক, সে তো সহজেই বোঝা যায়। ওরা অনেক সময় যে-সব জায়গায় শিক্ষিত মানুষের চলাচল প্রায় নেই বললেই হয়, ঘন বনের মধ্যে, দুরন্ত নদীর ওপারে, খাড়া পাহাড়ের পেছনে নানা রকম দুর্গম জায়গায় রেকর্ডার ক্যামেরা ইত্যাদি লটবহর নিয়ে ভারতের উপজাতীয়দের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আসে। এ-ও সেই ধরনেরই একটা ব্যাপার।

ম্যাপে ভারতের উত্তর-পূব কোণাটা দেখে মনে হয়, প্রকাণ্ড একটা ঘোড়া পশ্চিম-বঙ্গের ঘাড়ের ওপর দিব্যি মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগে ওদিককার সমস্ত জায়গা-টাকেই আসাম বলা হত, এখন ভাগ ভাগ হয়ে, নানান্ নতুন নাম হয়েছে। সেই রকম একটা অল্প-চেনা জায়গায়, পাহাড়ের পায়ের কাছে উপজাতীয়দের একটি সুন্দর গ্রাম। বড় বড় সেগুন-গাছ, বাঁশ-ঝাড় যেন গ্রামটির সঙ্গে কোলাকুলি করবার জন্য পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। দেখলে চোখ

জুড়োয় ; মনে হয় এমন জায়গায় দুদিন থাকি। গ্রামের নাম হাতিয়া।

কিছুদিন আগেও এরা কোনো বিদেশী লোককে গাঁয়ে ঢুকতে দিত না। বলত তাহলে ওদের আর কিছু বাকি থাকবে না। ওরা নাকি আর্যরা এ-দেশে আসবার আগে থেকেই ঐ গ্রামে বাস করে। আজকাল ওদের প্রধানের মত নিয়ে কিছু বাইরের লোক গাঁয়ে ঢুকতে পায়। ভারত সরকার ওদের জন্য হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, পাহাড়ের ঝরণা থেকে পাইপে করে জল আনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলে, সেবার তথ্য ও বেতারের দলকে ওদের শীত বিদায়ের উৎসবে আসতে অনুমতি দিয়েছিল। চমৎকার উৎসব। একেবারে অন্য ধরনের। পাহাড়ের পায়ের কাছে রঙীন পাথর দিয়ে বাঁধানো এক গর্ত ; গর্তের পাশে সুন্দর কারিকুরি করা কাঠের এক মন্দির ; মন্দিরে ঠাকুর-দেবতা নেই, কিন্তু চার দেয়াল আর ছাদ জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট খোদাই করা মূর্তি। হাতি-মার পাশে বাচ্চা হাতি, মানুষ-মার কোলে ছোট্ট ছেলে। পূজো বলেও কিছু নয়। সারি সারি গাঁয়ের মা-মেয়ে ছেলে-বুড়ো ঘড়ায় করে দুধ, ডালায় করে ফল, ভাঁড়ে করে মধু এনে, থরে থরে সাজিয়ে দিয়ে গেল। পরে ঘণ্টা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে সেগুলোকে বাঁকে করে ঘন বনে নিয়ে গিয়ে রেখে আসা হল। ফিরে এসে নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ।

তথ্য বিভাগের ছোকরাদের কি দুঃখ, তা অমন ভালো জিনিস বনে ফেলে আসা কেন? নিজেরা না খাবি তো বাইরে থেকে আসা অন্য লোক-ও তো আছে! উপজাতীয় ছেলেদের একজন জিব কেটে বলল, "ছি ছি, অমন কথা বলবেন না, ও জিনিস হাতিদের কাছে উৎসর্গ করা। ওঁরা খাবেন।"

"তা ওনারা টের পাবেন কি করে যে খাবার এসেছ?"

"কেন, ঘন্টির আওয়াজ, গানের সুর কানে গেলেই ওনারা পাহাড় থেকে নেমে আসেন। ওনাদের কান বড় সজাগ।"
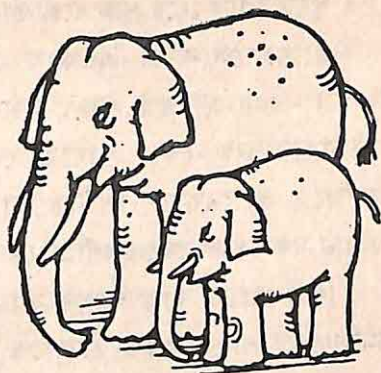
"কিন্তু এত জানোয়ার থাকতে হাতিকে কেন খাওয়ানো?" তখন গ্রামের সব চেয়ে বুড়ো অধিবাসী ওদের দুই মায়ের গল্প বলেছিল। এই হল সেই গল্প।

সেকালে হাতির দেশ ছিল ওটা। মানুষে হাতিতে মিলেমিশে বেশ ছিল। তারপর বিদেশী সওদাগররা মোহর দিয়ে হাতি কিনতে এল। গাঁয়ের মেয়েরা মোহর গেঁথে মালা পরে বাহার দিতে লাগল। হাতি ধরার অন্য কায়দা জানত না কেউ, তাই ফাঁদ পেতে হাতি ধরা শুরু করল। কেমন ফাঁদ? না, হাতি চলার পথে গভীর সব গর্ত খুঁড়ে গাছের সরু সরু ডালপালা লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখত। হাতিরা টের পেত না। ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ডালপালা ভেঙে গর্তে পড়ত। কি তাদের বিকট চ্যাচানি! সেই চ্যাচানি শুনে গাঁয়ের লোক দৌড়ে এসে দড়ি-দড়া দিয়ে হাতি বেঁধে ফেলত। সওদাগরদের লোকেরা এসে গাছের গুঁড়ি ফেলে গর্ত থেকে হাতি তুলে, গাঁয়ের প্রধানকে টাকা দিয়ে চলে যেত। সে হাতিরা আর বনে ফিরত না। তখন থেকে হাতিদের সঙ্গে গাঁয়ের লোকদের সদ্ভাব রইল না। কি করে থাকবে? সামনাসামনি লড়াইয়ের শত্রুকে ক্ষমা করা যায়; কিন্তু যারা লুকিয়ে

গর্ত খুঁড়ে ফাঁকি দিয়ে শত্রু ধরে, তাদের কখনো ক্ষমা করা যায় ?

গাঁয়ের লোকদের এতকাল এক শত্রু ছিল, পাহাড়ের কালো বাঘ। এখন হল দুই শত্রু ; কালো বাঘ আর বনের হাতি। হাতি তাড়াবার জন্য ক্ষেত পাহারা দেবার ব্যবস্থা হল। ঢাক ঢোল বাজিয়ে, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে জানান দেওয়া হত হাতি আসছে। অমনি সব মশাল জ্বেলে বর্শা হাতে তৈরি হত।

কিন্তু কালো বাঘ আসত জানান না দিয়ে, অন্ধকারের সঙ্গে গা মিলিয়ে। তাকে কেউ ঠেকাতে পারত না। একদিন শীতের শেষে ঘরের দোর-জানলা খুলে লোকে বসন্তের হাওয়াকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এমন সময় রাত দুপুরে ঢাক ঢোল বেজে উঠল ; হাতির পাল দেখা দিয়েছে। অমনি যেখানে যত পুরুষ-মরদ ছিল, সব ছুটল হাতি ঠেকাতে, নইলে শীতের ফসল আর দেখতে হবে না।

সেই ফাঁকে কালো বাঘ এসে প্রধানের পাঁচ মাসের ছেলেকে গায়ে জড়ানো কাঁথাসুদ্ধ তুলে নিয়ে দে ছুট। ছেলের মা-দের পাতলা ঘুম হয়, অমনি জেগে বাঘকে দেখতে পেয়ে, বাইরে থেকে জ্বলন্ত মশাল তুলে নিয়ে 'লখিয়া রে—এ—এ!' বলে ডাকতে ডাকতে প্রধানের বৌ বাঘের পিছনে ছুটল। ঘরে আর কেউ নেই। পাড়ার মেয়েরা টের পেলেও, নিশ্চিত মরণের দিকে কেউ দৌড়ে এল না।

বনের দিকে ছুটল বাঘ। বনে ঢুকেই হাতি চলার পথ। সেখানে ফাঁদ ; ফাঁদের ডালপালা ভাঙা ; ফাঁদের মধ্যে হাতি পড়েছে। বাচ্চা হাতি। ভিতর থেকে সে মানুষের ছেলের মতো কাঁদছে। ওপরে ছায়ার মতো তার মা গর্তের চারদিকে পাগলের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে! বাঘ তার পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

চোখের কোণা দিয়ে দুই মা দুজনকে দেখল। অমনি বাজের

মতো বিকট আওয়াজ করে মা-হাতি বাঘের পিছনে বিদ্যুতের বেগে দৌড়ল। গর্তে ছানা পড়ে রইল। তারপরেই বন ফাটানো আর্তনাদ। ছেলেটাকে শুঁড়ে করে মা-হাতি ফিরে এসে, প্রধানের বৌয়ের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে, গর্তের কিনারায় চুপ করে দাঁড়াল। কাঁথা-জড়ানো ছেলের গায়ে আঁচড়টি পড়েনি।

ছেলেটা সেইখানে পড়ে তারস্বরে চ্যাচাতে লাগল। প্রধানের বৌ তরতর করে ফাঁদের ধারে কাটা খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে নিচে নেমে গেল। হাতির ছানা বেজায় ভয় পেয়েছে, কিন্তু ব্যথা লাগেনি। তবে গর্ত থেকে তাকে তোলা দরকার। বৌ আবার ওপরে উঠে এসে মাঝারি দেখে দুটো গাছের গুঁড়ি আড়ভাবে গর্তে ফেলল। সিঁড়ির মতো গুঁড়ি দুটি কাৎ হয়ে রইল। তারপর বৌ আবার নেমে গিয়ে বাচ্চাটাকে ঠেলেঠুলে গুঁড়ি বেয়ে ওপরে তুলল। নিজেও লাথি-ঠোক্কর কম খেল না।

ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে। হাতির পাল তাড়িয়ে প্রধান ঘরে এসে দেখে চারদিকে বাঘের থাবার দাগ। তার আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। দড়ি-দড়া, দা-কুড়ুল লোকজন নিয়ে সে-ও বনে ছুটল। বনে ঢুকে ফাঁদের কাছে পৌঁছে কেউ রা কাড়ে না! হাতির ছেলে হাতির মায়ের দুধ খাচ্ছে আর হাতির পায়ে ঠেস দিয়ে বসে প্রধানের বৌ তার ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। দা-কুড়ুল ফেলে দিয়ে গাঁয়ের লোকরা হাত জোড় করে বনের দিউকে কৃতজ্ঞতা জানাল।

প্রধানের বৌ ছেলে কোলে উঠে দাঁড়ল। হাতি-মা তার ছেলে নিয়ে বনে গেল। প্রধান তখুনি ফাঁদের গর্ত বুজিয়ে ফেলল। সওদাগরদের ভাগিয়ে দিল। আর কখনো এদিককার লোক হাতি ধরেনি।

সেই ইস্তক প্রতি বছর শীতের শেষে ক্ষেতের ফসল পাকলে হাতিদের নৈবেদ্য দেওয়া হয়, সে কি খুব অন্যায় হয়? ছবি তুলে গান রেকর্ড করে এরাও খুব খুশি। সবাই বলল, "না, কখনো না।"

রামধনু

সকাল বেলায় হাঁড়িমুখে পিলেই এসে বলল, "এবার পূজোয় আমাদের নতুন জামা স্যাণ্ডেল কিচ্ছু হবে না। বাবার চাকরি নেই, দাদা বলেছে দেবে না।" গুটে কিছু বলবার আগেই জপ করা থামিয়ে বুড়ি পিসি বলল, "তোদের আবার অত পূজো কি গা, তোরা তো মাদ্রাজি!" পিলেই বেজায় চটে গেল, "মোটেই না, আমরা তামিল। আমরা দুগ্‌গো পূজো করি। তা এবার কাপড়চোপড় কিচ্ছু হবে না।" এই বলে ফিক্ করে হেসে বলল, "আর আমার ছোট ভাই রামাইয়া না, সে আগে থাকতেই তার বন্ধু আব্বাস্‌কে ইজের দান করে, এখন গামছা পরে ঘুরছে! বেশ হয়েছে!"
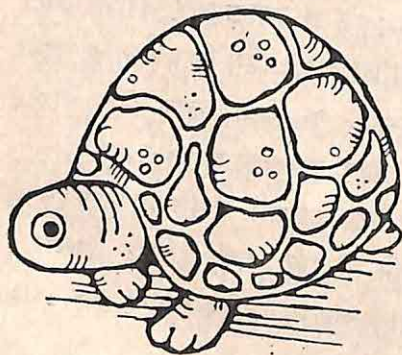
একটা রোগা লোক খালের ঘাটের সিঁড়িতে বসে ছিপ ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করছিল। সে বলল, "তাতে কি হয়েছে? আমিও তো গামছা পরে ঘুরে

বেড়াই। আমি কি খারাপ?”

গুটে, পিলেই ওর আঁচড় কামড়ের দাগ লাগা খড়ি ওঠা হাত-পার দিকে তাকিয়ে রইল। গুটে বলল, “কিচ্ছু হয় না সত্যি। আমাদেরো নতুন জামা হবে না। ঘরে জল ঢোকে, তাই তক্তাপোষ কেনা হচ্ছে। হারুকাকা বানাচ্ছে। চ’, দেখে আসি।”

খালের পাশে বুড়ো কচ্ছপ রোদ পোয়াচ্ছিল। গুটে বলল, “ওর বয়স তিনশো কুড়ি। সেকালে পর্তুগিজরা ওকে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেছিল, ওর গায়ে ইংরিজিতে তারিখ লেখা আছে।”

পিলেই বলল, “ইংরিজি কি রে! পর্তুগিজ ভাষায় বল্। আমার বন্ধু গোমেসরা পর্তুগিজ, সায়েব। ওর মা বলেছে।”

গুটে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। “হ্যাঁ, সায়েব না আরো কিছু! আমার চেয়েও কালো!” “কালো তাতে কি হয়েছে? গোমেসের মামা তো পাদ্রী সায়েব, সে তো কুচকুচে কালো। কালো হলে সায়েব হয় না?”

গুটে বলল, “কি জানি।—দাদু বলে কচ্ছপটার নাকি বাসা আছে; খালের জলের নিচে তার মুখ। ঢুকবার বেরুবার সময় কটর-মটর শব্দ হয়। দাদু বলে বাসায় ঢুকলে দেখা যাবে মরা মানুষের হাড়ের ঢিপি আর তাল তাল মোহর, হীরে, মণি, মুক্তো!” পিলেই বলল, “ইস্! কচ্ছপ ও-সব দিয়ে কি করবে, ভাই? আমরা পেলে বেশ জিনিস কিনতে পারতাম।” “নিতে গেলেই কচ্ছপ কামড়ে দেবে। জানিস্ তো কচ্ছপের কামড় কখনো ছাড়ে না।” তা-ও বটে।

হারুকাকা তক্তাপোষের পায়ার ওপর র‍্যাঁদা ঘষছিল। ওদের দেখে বলল, “এসেছিস্ তা ভালোই হয়েছে। আমার ছাদ দিয়ে জল পড়ে। নতুন টালি কিনেছি। তা আমি বলে বলে দিলে তোরা চার-

পাঁচজন মিলে টালিগুলো লাগিয়ে দিতে পারবিনে? তোদের তো আর ছাদে উঠলে মাথা ঘোরে না। যা গেছো স্বভাব তোদের।"

গুটে বলল, "বাবা তো তোমাকে টাকা দিয়েছে। তাই আমাদের পূজোর জামাটামা কিচ্ছু হবে না।"

হারুকাকা বলল, "আমারো তো হবে না।"

"তুমি তো বুড়ো।" "আহা! কি কথাই বললি, বাপ! এখন কাপড় পরব না তো পরবটা কবে শুনি? তোরা তো আজ না হক, দশ বছর বাদে নতুন কাপড় পাবি। আমি ততদিনে পটল তুলব। আচ্ছা, আচ্ছা, অত কথায় কাজ কি? আলি, ভুলি, ন্যাড়া, ভোঁদা, খেঁদি, সব্বাইকে ডেকে এনে, কাল রাতের আগে আমার ছাদ সারিয়ে দে, আমি প্রত্যেকটা মেয়েকে একটা করে হাত-পা-নাড়া কাঠপুতলি আর প্রত্যেকটা ছেলেকে একটা করে ফাস্ট কেলাস্ গুল্‌তি দেব। দেখতে পারিস্ গিয়ে, তাকের ওপর সাজানো আছে।" ওদের তখন পায় কে! ছুটল সবাইকে খবর দিতে।

আলির মা বলল, আলি আসতে পারবে না। তার জ্বর। পয়সা নেই বলে ওষুধ পড়েনি। পিলেই বলল, "কোনো ভয় নেই। আমার পেট ব্যথার বড়ি অনেক বাকি আছে, তাই এনে দেব। কাল আলি না এলে হবে না। হারুকাকা হাত-পা-নাড়া পুতুল দেবে। আরো কিছুটা গেলেই পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি। এখন ইস্কুল বন্ধ, পণ্ডিতমশাই সারাদিন দাওয়ায় বসে হুঁকো খান। সামনে দিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন। পিলেই বলল, "আর এগিয়ে কাজ নেই, চল্ ফিরে গিয়ে ফাঁস দিয়ে কচ্ছপটাকে ধরি। তারপর ওর বাসায় কি আছে দেখা যাবে।"

কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের বাজপাখির মতো চোখ। দূর থেকে ওদের

দেখে ডাক দিলেন। "বলি, সকাল থেকেই যে পাড়া চষে বেড়াচ্ছিস্? স্কুল খুললেই না পরীক্ষা? পূজোর সময় তো বই ছুঁবি না, কেবল নতুন জামা গায়ে হৈ—চৈ!"

ওরা একসঙ্গে বলল, "এবার আমাদের নতুন জামা হবে না।"

পণ্ডিতমশাই একটু হক্‌চকিয়ে গিয়ে বললেন, "ইয়ে—কি-বলে, তা আজ রাতে আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ হচ্ছে, তোরা এসে খেয়ে যাস্। খবরদার, পাঁচজনের বেশি আসবি না। নতুন গামছা পাবি, ছেলে চাকরি পেয়েছে।"

অমনি ছুটতে ছুটতে ফেরা, সবাইকে কথাটা বলতে হবে তো।

কচ্ছপটাকে তখনো রোদ পোয়াতে দেখে, পিলেই বলল, "দাঁড়া, ওকে ফাঁস দিয়ে ধরি।" এই বলে তরতর করে পাশের নিমগাছে চড়ে গেল। তারপর ফ্যাক্‌ড়া ডালে বসে, পকেট থেকে দড়ির ফাঁস বের করে অপেক্ষা করে রইল। যেই না কচ্ছপ শব্দ শুনে মুণ্ডু বের করেছে, অমনি সপাৎ করে ফাঁস লেগেছে। কচ্ছপটার সে কি ছট্‌ফটানি। যতই টানে, ফাঁস-ও ততই এঁটে বসে। কচ্ছপ শেষটা গলায় দড়ি পরে থুম হয়ে পড়ে রইল।

পিলেই গাছ থেকে নেমে, পাশ কাটিয়ে গুটেকে বলল, "চল্, বাসাটা দেখি।" গুটের তো ব্যাপার দেখে চুল খাড়া। সে বলল, "কো—কোথায়?"

"এখানেই যখন রোজ রোদ পোয়ায়, এখানেই বাসার মুখ হবে।"

ছেলে তো নয়, চিংড়িমাছ। যেমন ডাঙায়, তেমনি জলে, সমান দাপট। এক ডুব, দুই ডুব, তিন ডুবেই কচ্ছপের বাসার মুখের সন্ধান মিলল। বাসা তো নয়, গুহাও বলা চলে। মুখটা জলের তলায় বটে, কিন্তু ঢালু হয়ে উপরে উঠে গেছে, তাই বাসাটা শুকনো। কতকগুলো

নুড়ি আর পাথর আর কয়েকটা ভাঙা হাঁড়িকুড়ি আর একটা মরা মানুষের কঙ্কাল।

কোনো কথা না বলে ওরা ওপরে উঠে এল। উঠে এসে পিলেই বলল, "ওর বোধ হয় বাড়ি-ঘর, মা-বাবা কেউ ছিল না।" গুটে কিচ্ছু বলল না। ওর খুব খারাপ লাগছিল। পিলেই বলল, "চ', কচ্ছপটাকে ছেড়ে দিই।" "কি করে ছাড়বি? কাছে গেলেই তো কামড়ে দেবে, আর ছাড়বে না।" পিলেই বলল, "কায়দা আছে। গাছে চড়ে গিট খুলে, একদিক ধরে টানলেই খুলে আসবে।"

ছাড়া পাবামাত্র কচ্ছপটা পড়িমরি করে জলে ডুব দিল। ওরা দুজন গুটেদের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল। বুড়ি পিসি চন্দন বাটার খুদে পাথরে কি যেন বেটে, খুরিতে করে সাজিয়ে দিচ্ছিল। বেগনি রঙের বেগুনের খোসা, খানিকটা ধোপাদের নীল, কয়েকটা অপরাজিতা ফুল, একটু পালং শাক বাটা, খানিকটা গ্যাঁদাফুল, একটু গেরি মাটি, একটু চূণ-হলুদ গোলা লাল রঙ। গামছা-পরা রোগা লোকটা তদারক করছিল। চারদিকে ভিড় করে ছিল ভুলি, খেঁদি, গোমেস, আব্বাস। ওদের দুজনকে দেখে গামছা-পরা লোকটা খুসি হয়ে বলল, "ব্যস্ এই তো সাতজন হলাম। বলে বেগনি রঙের খুরি হাতে তুলে নিল। ওরাও পর পর নীলের, অপরাজিতার, পালং বাটার, গ্যাঁদার, গেরি-মাটির আর চূণ-হলুদ গোলা লাল রঙের খুরি নিয়ে তার পিছন পিছন রওনা দিল। বুড়ি পিসিও হাঁপাতে হাঁপাতে সঙ্গে চলল, "ও গামছা-পরা, একটু আস্তে চল্, নইলে পারব কেন?"

এতক্ষণ পর গুটে বলল, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে পিসি?" পিসি বলল, "ওমা, তাও জানিস্ না, বিষ্টি থামল, রোদ উঠল, তবু মেঘে রামধনু ফুটল না। তাই যাচ্ছি মেঘের ওপর রামধনু ফোটাতে।"

জল-মানুষ

জলের ধারে ভাঙা সিঁড়ির ওপর বসে থাকত টুনি। ভাবত যদি হঠাৎ একদিন জল-মানুষ উঠে আসে। হাতে ধন-রত্ন ভরা থলি নিয়ে। এসে বলে, "গয়না পরবে টুনি ?" তাহলে কি বলবে টুনি ?

টুনি কখনো গয়না পরেনি। শুধু একদিন এক টুকরো সোনালী জরি কুড়িয়ে পেয়ে হাতে বেঁধেছিল। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল !

কেউ যদি একটা আস্ত লাল শাড়ি দিত, তাহলে কেমন হত ? নতুন শাড়ি কেউ দেয় না। নতুন হবার দরকার নেই, কিন্তু এটার মতো ছেঁড়া নয়। এটার মতো কালো-ও নয়। কেমন লাল শাড়ি গায়ে দিয়ে, গলায় পুঁতির মালা ঝুলিয়ে, হাতে লাল নীল কাচের চুড়ি পরে, জলের ধারে বসে নিজের ছায়া দেখবে টুনি।

তার ওপর সারাক্ষণ খিদেও পায়। মা সকালে পাঁচ বাড়িতে বাসন মাজে, বিকেলে তিন বাড়িতে। সবাই এক মুঠো করে ভাত তরকারি দেয়। মা একটা ঢাকনা দেওয়া হাঁড়ি করে, সব মিলিয়ে নিয়ে আসে। টুনিকে বলে, "মোড়ের কল থেকে বাল্‌তি করে জল

এনে রাখতে পারিস্ না ? দু' ঘটি মাথায় ঢেলে খেতে বসি।"

ফুটো বালতিতে জল থাকে না। মা বলে, "পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে একটু গালা চেয়ে এনে ফুটো বন্ধ কর্ গে যা।"

টুনি যায় না। গেলেই পণ্ডিতমশাই বলেন, "একটা বর্ণ-পরিচয় এনে এইখানে বসে, মাটিতে আঁচড় কেটে লেখাপড়া শেখ্!" মা বলে "লেখাপড়া শিখলে বাঁদর হয়।"

শুনে শুনে অক্ষর চেনা হয়ে গেছে টুনির। কিন্তু মা-ই প্রায় সব ভাত খেয়ে ফেলে, টুনির জন্য এতটুকু রাখে, তাতে পেট ভরে না। কেউ যদি একদিন একটা বড় কলাপাতায় গরম ভাতের ওপর চাপ-চাপ ডাল আর মূলোর ঘণ্ট ঢেলে দিয়ে বলত, "আয় টুনি, খাবি আয়। পরে তেঁতুলের মিষ্টি অম্বল দেব—" তাহলে কি ভালোই না হত। বিকেলে হয়তো মা দুটো ঠাণ্ডা হাতরুটিতে একটু ঝোলা গুড় ঢেলে দিয়ে বলবে, "এই খেয়ে শুয়ে পড়।" মা নিজে কিন্তু—

ঠিক এই সময় খালের জল থেকে চুলের জল ঝাড়তে ঝাড়তে জল-মানুষ উঠে এল। ঠিক যেমন বই থেকে পড়ে পণ্ডিতমশায়ের মা বলেছিল। গা থেকে টপ-টপ করে জল পড়ছে, ফরসা রঙ, সুন্দর দেখতে। হাতে একটা থলি।

তাই দেখে টুনির বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। ওকে দেখে জল-মানুষ বলল, "খুকি, আমাকে একটা লুকিয়ে থাকার জায়গা বলে দিতে পার, যেখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না ?"

টুনি বলল, "হ্যাঁ, পারি। আমার নাম টুনি।" ডাঙায় উঠে জল-মানুষ ঘুরে ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। টুনি তার হাত ধরে বলল, "চল, আমার সঙ্গে। কাঠ-গুদামে এ সময় কাজ হয় না, কেউ যায় না। তুমি ধাড়ি ইঁদুর ভয় পাও না তো ?"

জল-মানুষ বলল, “মানুষ ছাড়া আমি কাউকে ভয় পাই না।”

খালের ধারে গুদাম। দরজায় তালা দেওয়া। কিন্তু পোড়ো বাড়ির ভাঙা ইঁটের গাদায় পা রেখে রেখে উঠলে, ছাদের তলায় বাতাস খাবার ফাঁক দিয়ে ভিতরে গলে যাওয়া যায়। শীতের আগে দরজার তালা খোলা হবে না।

“হ্যাগো জল-মানুষ, ইঁট বেয়ে উঠতে পারবে তো?” জল-মানুষ বলল, “স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠতেও পারব।”

অনেক কষ্টে উঠল সে। বাতাস যাবার ফাঁকের নিচেই একটা তাকের মতো। সেখানে গুদোমের মালিকের চটের থলি থাকে। টুনি বলল, “চটের থলি দিয়ে মাথা মুছে, চটের থলি গায়ে দিয়ে শুয়ে থেকো।”

জল-মানুষ বলল, “আমার যে খিদে পেয়েছে।” খিদে পেয়েছে? শুনে টুনির বড় দুঃখ হল। ওরও তো সারাক্ষণই খিদে পায়। টুনি বলল, “ঐ ইঁটের ওপর বস। এখানে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। আমি খাবার এনে দিচ্ছি।”

মাঝে একটা দেয়াল। তার ওপাশে টুনির মায়ের খোলার ঘর। ঘরে একটা হাঁড়িতে টুনির রাতের খাবার ঢাকা ছিল। মা দুপুরে এনে দিয়েছিল। রায়বাবুদের মেয়ের বিয়ে, মা সেখানে খাটতে গেছে। ফিরতে সকাল হবে। বিকেলে একবার এসে এক রাশি লুচি মাছ-ভাজা আর রসগোল্লা দিয়ে গেছে। সেখানে নাকি ভিয়েন বসেছে। যারা খাটছে, সবাই খাচ্ছে, বাড়ির জন্য নিয়ে যাচ্ছে। দুপুরে কাঁচা পেয়াজ দিয়ে পান্তা ভাত খেয়েছে টুনি।

টুনি জিজ্ঞেস করল, “দুপুরে ভাত খাওনি?” জল-মানুষ বলল, “কি যে বল! দুপুরে ভাত খাব কি! আমার পেছনে যে

প্যায়দা লেগেছে। কুকুর দিয়ে শুঁকে শুঁকে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ডুব সাঁতার দিয়ে পালিয়ে চলেছি, তাই ধরতে পারেনি। কাল রাতেও খাওয়া হয়নি। যা হয় চাট্টি এনে দাও।”

টুনি এক দৌড়ে গিয়ে হাঁড়িসুদ্ধ খাবার নিয়ে এল। ভেবেছিল দুজনে ভাগ করে খাবে। তা জল-মানুষ করল কি, হাঁড়িটা কোলের ওপর নিয়ে গপাগপ করে সব খেয়ে ফেলল। অ্যালুমিনিয়মের ঘটিতে জল এনেছিল। খাওয়া হলে ঢক্‌ঢক্ করে এক ঘটি জল গলায় ঢেলে জল-মানুষ বলল, “আঃ! আমার প্রাণটা বাঁচালে দিদি। তোমাকে কি দিই বল তো? গয়না নেবে? কাউকে দেখিও না কিন্তু।”

এই বলে টুনির চোখের সামনে থলিটা খুলে ধরল। তখনো দিনের আলো একটু ছিল। টুনি দেখল থলিটা সত্যি সত্যি হীরে-মানিক দিয়ে ঠাসা।

আস্তে আস্তে টুনি মাথা নাড়ল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

জল-মানুষ ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বলল, সে কি! তোমার গয়না পরতে ইচ্ছে করে না?”

টুনি বলল, “করে। পুঁতির মালা, কাচের চুড়ি, এইসব পরতে ইচ্ছা করে।”

জল-মানুষ বলল, “নাও না এই ছোট আংটিটা। ওটা বেচলেও তো অনেক টাকা পাবে। চুড়ি, মালা, নতুন শাড়ি কিনবে।”

টুনি মাথা নাড়ল। বলল, “তাহলে তুমি কেন ছেঁড়া জামা পরেছ?”

জল-মানুষ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, পকেট থেকে একটা ময়লা দু' টাকার নোট বের করে বলল, “খুকি, এই দিয়ে পুঁতির মালা,

কাচের চুড়ি কিনো, কেমন? আর—আর বোধ হয় আমি তোমার খাবারটা খেয়ে ফেললাম, কিছু খাবার-ও কিনো। ও আমার নিজের রোজগার করা টাকা। তুমি না নিলে আমার খুব কষ্ট হবে।”

টুনি হাত পেতে নোটটা নিল। তারপর জল-মানুষটা ইঁট বেয়ে গুদোম-ঘরে ঘুমোতে গেল। টুনি আস্তে আস্তে দোকানে গিয়ে গরম গরম হাত-রুটি আর ডাল আর কাঁচকলার টক চাট্‌নি কিনে খেয়ে, মা যেমন বলেছিল, দরজার খিল বন্ধ করে শুয়ে রইল।

সকালে মা এসে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙাল। মা অনেক ভালো ভালো খাবার এনেছিল। মা পণ্ডিতমশাইদের পুকুরে চান করতে গেলে, টুনি খাবারদাবারগুলো গুছিয়ে রাখল। মা এসে মাদুর পেতে শুয়ে বলল, “আমি খেয়ে এসেছি। ও-সব তোর। রাতের জন্যেও অনেক থাকবে। কাল খেয়েছিলি?” টুনি বলল, “হ্যাঁ।” মা একটা হাই তুলে বলল, “বিয়েবাড়িতে এক কাণ্ড, বুঝলি। কনের সব গয়না কাল রাতে চুরি গেছিল। আবার আজ রাতে বিয়ের আগেই, কে যেন জানলা দিয়ে সব ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল!” অনেক পরে মা কাজে গেলে, টুনি কাঠ-গুদোমে গিয়ে ডাকল, “জল-মানুষ, ও জল-মানুষ!” তার পরেই দেখল কয়লা দিয়ে কে দেয়ালে লিখে রেখেছে, “খুকি, আমি মায়ের কাছে ফিরে গেলাম।”

কাঠের ঘোড়া

কাঠের ঘোড়া কথা বলে। বেশ রাগী, খিট্‌খিটে। দাদুর কাঁঠাল-কাঠের তক্তাপোষের একটা পায়াতে খোদাই করা। বাকি তিনটে পায়া ন্যাড়া। ঘোড়া খালি খালি খুঁৎ খুঁৎ করে বলে, "তারা কই? তারা কই?"

পুঁটি দাদুর তক্তাপোষের ওপর থেকে চোখ বুজে শোনে, কিছু বলে না। কাঠের ঘোড়া কখনো কথা বলতে পারে? তবে কেউ কাছে থাকলে কিছু বলে না। সকালে দিদু রান্নাঘরে গেলে, দুপুরে দিদু খেতে গেলে, ঘোড়া খালি-খালি বলে, "তারা কই? তারা কই?" পুঁটি কোনো জবাব দেয় না। তার মন খারাপ।

রিক্‌শ থেকে পড়ে গিয়ে তার হাঁটু জখম হয়েছে। একটা পা একটু ছোট হয়ে গেছে। খুঁড়িয়ে হাঁটে। ছেলেমেয়েরা দেখে হাসে। পুঁটি কাঁদে। তাই দাদু ওকে এখানে নিয়ে এসেছেন। এখানেও পুঁটি খালি খালি কাঁদে। কারো সামনে বেরোয় না। দাদু দিদু কত দুঃখ করেন।

কি ভালো জায়গা। মাটির ঘর, খড়ের চাল, লাউয়ের মাচা, চাল্‌তা গাছ, তেঁতুল গাছ, আম-কাঁঠাল-কালোজাম। বাতাবি লেবুর গাছ-ভরা ফুল, তার কি সুবাস। কাঠবেড়ালি দৌড়য় ; রাতে খরগোশ এসে দাদুর কচি ঢ্যাড়স খায়। দাদু রেগে বলেন, "তক্তা-পোষের ঠ্যাং খুলে পেটাব।"

পুঁটির ভয় হয়। "তাই বলে ঘোড়া-ঠ্যাংটা খুল না দাদু। ও কথা বলে।"

দাদু হাসেন। বলেন, "আমার দাদু খোদাই করেছে। তখন রেলের লাইন পাতা হয়। গাড়ির সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে, ব্যস! ঠ্যাংটাই গেল কাটা! দেখিস্‌ গিয়ে হাসপাতালে তেলে ডুবিয়ে বোতলে ভরে রেখেছে।"

পুঁটি বলল, "তাহলে বাকি তিনটে ঘোড়া করেনি কেন বুড়ো? ওর বুঝি একলা লাগে না!"

দাদু শুনে অবাক! "ও মা! তা কি করে করবে? বুড়োকে নিতে যে নৌকো এল। অমনি হাতুড়ি, বাটালি, নরুণ ফেলে রেখে দিয়ে সে গিয়ে নৌকায় চড়ল। তক্তাপোষের গায়ে দেরাজ আছে, তাতে দেখ সব হাতিয়ার এখনো আছে। ঘোড়া কাটতে কেউ পারে না।"

ঘোড়া বলল, "ফুঃ!" দাদু খেয়াল করলেন না। রোজ সকালে পুঁটিকে দুধ আর মোহনভোগ খাইয়ে, দিদু চলে যান, রাঁধেন-বাড়েন, কাপড় কাচেন, ঘর নিকোন, চান করেন। বেলা বারোটার আগে এদিকে আসেন না। পুঁটি শুয়ে শুয়ে কাঁদে।

দাদু বাগান দেখেন, সরকার দাদার সঙ্গে কথা বলেন, ডাক-ঘরে যান, দোকানে যান, ফিরে এসে চান করেন। আর পুঁটি তার বেঁটে ঠ্যাংটাকে দেখে আর কাঁদে।

সেদিন দাদু চলে যেতেই, ঘোড়া আবার বলল, "তারা কই? তারা কই?"

এর আগে পুঁটি কখনো কাঠের ঘোড়ার কথায় কান দেয়নি। আজ বলল, "কারা?"

ঘোড়া নাক দিয়ে ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ আওয়াজ করে বলল, "কারা আবার? ঝড়, ঝরণা আর আগুন। আমি হলাম গিয়ে বিজলী। তারা কই?"

পুঁটি বলল, "রোসো, দেখছি।"

এই বলে খাট থেকে নামল। ঘোড়াও অমনি চুপ করল। পুঁটি তখন দেরাজ টানল। ক্যাঁচ করে সেটা খুলে গেল। তার ভিতরে একটা ছোট হাতুড়ি, একটা বাটালি, একটা ছেনি, একটা নরুণ, এক শিশি তেল, এক টুকরো ন্যাকড়া।

পুঁটি আগে তেল-ন্যাকড়া দিয়ে হাতিয়ার সাফ করল। ঘোড়া বলল, "বাহবা, বাহা!"

পুঁটি ঘোড়ার পাশের পায়াটার সামনে বসে বলল, "একে আগে করি।"

ঘোড়া বলল, "চিঁহি!" বলে খুসির চোটে পুঁটির খারাপ হাঁটুতে ছোট ছোট লাথি মারতে লাগল।

পূঁটি বলল, "উঃ!" ঘোড়া বলল, "সেরে যাবে। সব সেরে যাবে।"

পুঁটি উঠে, স্যুটকেস থেকে পেন্‌সিল বের করে আবার বসল।

আগের পায়ার ওপর একটা ঘোড়া আঁকা হল। আগের ঘোড়ার মতো ঠিক নয়। সামনের দিকে মুখ আর দুটো ঠ্যাং। পেছন দিকে ল্যাজ আর দুটো ঠ্যাং। ঠ্যাংগুলো এক জায়গায় জড়ো করা।

তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে হাতুড়ি বাটালি দিয়ে বড় বড় ফাঁকগুলো

কূরে বের করে আনল। তারপর নরুণ দিয়ে মুখটা করল। ঘোড়া বলল, "সবাইকে দুটো করে ডানা দিও। নইলে কাঠের পায়ে হাঁটবে কি করে?" পুঁটি ডানা খোদাই করল।

যখন রেলের ঘড়িতে টং-টং করে বারোটা বাজল, পুঁটি উঠে, হাতিয়ার তুলে, কাঠের কুচি খাটের তলায় গুঁজে, চুপ করে শুল।

দিদু এসে চান করাতে নিয়ে গেলেন। দাদুর পাশে বসে আতপ-চালের গরম ভাত, গাওয়া ঘি, আলু ভাতে, মুগের ডাল, মৌরলার ঝোল, তেঁতুলের অম্বল আর বাপির ছোটবেলাকার লাল-পাথরের বাটিতে চিনি-পাতা দই সব চেটেপুটে পুঁটি খেয়ে ফেলল। অনেক দিন পরে পুঁটিকে হেসে কথা বলতে শুনে, দাদু দিদু যেমনি অবাক তেমনি খুসি।

তারপর ঘুম। বিকেলে এক বাটি দুধ আর মস্ত একটা মুড়ির মোয়া খাইয়ে দিদু বললেন, "বাইরে বসবি চল্। গাছ থেকে ফুল পড়ছে।"

পুঁটি বলল, "গাছতলা পাশের বাড়ি থেকে দেখা যায়।" ঘোড়া বলল, "ন্যাকা! দেখা যায় তো কি হয়েছে।" ঘোড়াটার তো ভারি বাড় বেড়েছে। লোকের সামনে কথা কইছে। পুঁটি বাইরে গিয়ে বসল।

সে দিন থেকে রোজ পুঁটি সারা সকাল ঘোড়া খোদাই করে। তিনটে তিন রকম। সব ঘোড়া কি একরকম হয়? আগের ঘোড়া কানের কাছে বলে, "আরো টানো! ডাইনে ঘোরাও! কূরে বের কর!" এই রকম কত কি! ভুল করলে কেঠো পায়ে ব্যথার হাঁটুতে লাথি মারে। পুঁটি হাঁটুতে জোর পায়। উল্‌টে ঘোড়াকে ঠেলা দেয়। পুরনো খাট নড়বড় করে। ঘোড়া ফিক্-ফিক্ করে হাসে।

যখন সামনের ঘোড়া শেষ করে পুঁটি পেছনের পায়া নিয়ে বসল, দুই ঘোড়াতে পাঠ দিতে লাগল। এরা আজকাল পায়া থেকে নেমে এসে ডানা ঝাপটায়। ভুল করলেই খারাপ হাঁটুতে খটাখট্ লাথি ঝাড়ে।

ষষ্ঠির দিন চারটে ঘোড়াই হয়ে গেল। পুঁটি তাদের চুমু খেয়ে বলল, "ঝড়, ঝরণা, আগুন আর বিজলী! তোমরা ভালো ঘোড়া হবে। দুধ খাওয়া নিয়ে গোলমাল করবে না।"

ঘোড়ারাও ওর খারাপ হাঁটুতে মাথা ঘষে আদর করল। ব্যথা হাঁটু সেরে গেল। পুঁটি উঠে দাঁড়িয়ে দেখল লাথি খেয়ে খেয়ে কবে ওর দুটো পা সমান হয়ে গেছে!

ঠিক এমনি সময় মা, বাবা, দাদা, দিদি হাত ভরে খেলনা, খাবার, ছবির বই নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর কি আদর, কি মজা!

তক্তাপোষের চার পায়ায় চার ঘোড়া আর খাটের তলায় কাঠের কুচি দেখে বাবার মুখ হাঁ হয়ে গেল। পুঁটির পা দুটো সমান হয়ে গেছে দেখে সবাই আরো অবাক হল।

পূজোর পর বাড়ি ফিরে যাবার আগে পুঁটি চার ঘোড়ার মুখে চুমু খেয়ে, একটু করে বাতাসা মাখিয়ে বলল, "শীতের ছুটিতে আবার আসব। এসে যেন দেখতে পাই।"

ঘোড়ারা বলল, "দেখবে, দেখবে, দেখবে!"

আগুনি-বেগুনি

এক-ই রকম দুই পুত্‌লি। নাম তাদের আগুনি-বেগুনি। এক-ই রকম তবু তফাৎ অনেক। আগুনির চোখ কালো, বেগুনির চোখ নীল। আগুনির চুল কালো, বেগুনির চুল সোনালি। হাতে-আঁকা দুটো মুখ, তা না হলে হুবহু এক।

আরো তফাৎ ছিল। আগুনির জামার কমলা রং; বেগুনির জামার বেগ্‌নি রং। আগুনির পায়ে লাল জুতো; বেগুনির পায়ে সাদা জুতো। কি ভালো দেখতে দুজনে; চোখ ফেরানো যায় না। দুজনকে সমান ভালোবাসে পুঁটি। সমান চুমু খায়। সমান কোলে নিয়ে নীল চামচে ওষুধ খাওয়ায়। সমান দোল দিয়ে ঘুম পাড়ায়।

তবু রোজ মা-কে বলে পুঁটি, ঐ দেখ মা, আবার ঝগড়া করছে!

মা বলেন, কেন রে, কি নিয়ে ঝগড়া? পুঁটি চোখ গোল করে বলে, ও মা জান না, বেগুনি খালি বলে—আগুনির আমটা বড়, আমারটা ছোট। আগুনি বলে—বেগুনির বালিশটা বেশি নরম। এই রকম। যত বলি ছিঃ, ঝগড়া করে না। কিছুতেই শোনে না।

তাই আজ দুজনকে ঘরের দু' কোণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি।

তারপর চোখ পাকিয়ে বলে—কেঁদে কিছু হবে না। ভালো হও, কোলে নেব।

যে-দিন পিসির মেয়ে মিনি আসে, পুত্‌লি দুটোকে পুঁটি আলমারির মাথায় তুলে রাখে। মিনি বড় ছোট, যদি খারাপ করে দেয়!

একদিন মা বললেন—কাপড়ের পুত্‌লি, ও ভাঙেও না, মটকায়ও না। তাহলে তোলা কেন?

—যদি লেবুর রস লাগায়। না, মা, আমার পুত্‌লি ওকে দেব না। বিকেলে মিনিরা বাড়ি চলে গেল।

পরদিন সকালে পুঁটি আলমারির মাথা হাতড়ে দেখে, ওমা! এ কি হল, না আগুনি, না বেগুনি, কেউ কি বেরোল? কোথায় গেল, কোথায় গেল? তবে কি ইঁদুরে খেল?

খোঁজ খোঁজ সব জায়গায়। আলমারির পেছনে, খাটের তলায়। গত বছরের দুটি কাঠ-পুত্‌লি, রং-চটা, ইঁদুরে-খাওয়া। তার আগের দুটি কাচ-পুত্‌লি, ফাটা-ফোটা, চোখ-ওঠা। কেউ পোছে না, কেউ খোঁজে না। সব বেরোল। কিন্তু নাঃ, না আগুনি না বেগুনি। পুঁটি কেঁদে সারা।

মা বললেন, এ কেমন ধারা? কোথায় পাবে ও-দুটি? অনেক দেখেশুনে, বুঝতে পারল আগুনি-বেগুনি চলে গেছে মিনিদের বাড়ি, ঝুড়িতে ঢুকে তাড়াতাড়ি।

তখন উঠে মুখ ধুয়ে, পিসির বাড়ি গিয়ে দেখে পুঁটি, আগুনি-বেগুনি পিসির হাতে সেলাই করা নতুন নীল গোলাপী জামা পরে, সোনালী বাক্‌সে কাচা কাপড় নিয়ে, পুঁটি কখন আসবে বলে বসে আছে।

আর মিনি তার নতুন ডল বের করে পুঁটির কোলে দিল। এত ভালো! পুঁটির মুখে হাসি চোখে জল। আগুনি-বেগুনিকে ডেকে বলল, "মিনির মতো ভালো হবে। সব জিনিস সবাইকে দেবে। বাড়িতে কেউ এলে আলমারি চড়ে বসবে না।"

চিড়িয়াখানা

মনের দুঃখে রেগেমেগে বিশু ঐ বনে এসেছিল। বাবা বলেন বন নয়, বনভূমি। ওখানে ডাকাত, হিংস্র জানোয়ার ইত্যাদি কিচ্ছু নেই। এ বন ঘরের চেয়েও নিরাপদ। বাবার জানা উচিত, কারণ বাবা বন-বিভাগে কাজ করেন।

রাগ বা দুঃখ হলেই বিশু ঐ বনে চলে আসে। মন ভালো হয়ে যায়। সব মাইনের টাকা বাজারে কে বাবার পকেট থেকে তুলে নিয়েছিল, তাই ওদের পুজোর কাপড়চোপড় কেনা হল না। বিজয়ার পর পয়সা খরচ করে গৌহাটিতে দিম্মার বাড়িতেও যাওয়া হল না।

এ জায়গাটা বড় ভালো। কেমন রাগ পড়ে যায়! ত্রিশ হাত উঁচু থেকে ঝর ঝর করে দিনরাত জল পড়ে, তলায় একটা ছোট্ট গোল

দীঘি হয়েছে। সেই দীঘি থেকে একটা নদী বেরিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে।

নদী নয় নালা। এত ছোট, এত সরু। কিন্তু কি তার স্রোত, কি তার রূপ! নালা কখনো এমন সুন্দর হয়? ছোট বড় নানা রঙের গোল পাথরের ওপর দিয়ে ছল-ছল করে জল ছিটিয়ে, পাক খেয়ে, খুদে খুদে ঢেউ তুলে, কলকল শব্দে সেই নদী ছুটে চলেছে। দু' পাশের ছাতার মতো বড় বড় ফার্ন-গাছের ঝুলো পাতায় জলের ফোঁটা লেগে থাকছে; তারপর এক সময় টুপ করে ঐ জলেই ঝরে পড়ছে। দুধার থেকে ফার্নের ঝালর-পানা পাতাগুলো জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। এক জায়গায় দুই তীরের পাতা জুড়ে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে কুল কুল কল কল করে জল ছুটে চলেছে।

জুতো বগলে নিয়ে, মাথা নিচু করে বিশুও চলল সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে। কি ঠাণ্ডা জল, কি চমৎকার জায়গা। মাঝে মাঝে পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ ঢুকে জলের গায়ে বাঘের মতো ডোরা কেটে দিচ্ছে। সেই বাঘ-ডোরার তলা দিয়ে জল দৌড়চ্ছে। হঠাৎ সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেল। কুলকুল করে জলের স্রোত রোদে বেরিয়ে, ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে হাসতে ছুটতে লাগল।

টলটল করছে পরিষ্কার জল। তলা দেখা যাচ্ছে। বালি। বালির ওপর নানা রঙের নুড়ি গড়াচ্ছে, সাদা হলুদ গোলাপী লাল কুচকুচে কালো। ছোট ছোট মাছ বিদ্যুতের মতো ঝলক দিচ্ছে। নুড়ির আড়াল থেকে বড় মাছগুলো জুলজুল করে বিশুর পায়ের দিকে তাকাচ্ছে। জলের তলায় পায়ের আঙুলগুলো কেমন সুন্দর ফরসা দেখাচ্ছে।

ঝুপ করে এক পাঁটি জুতো বগল থেকে খসে জলে পড়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল। অমনি বুড়ো-আঙ্গুলের-নখ-ছ্যাচা একটা হাত খপ করে জুতোটি তুলে ধরে বলল, 'নাও। জল নেড়ো না! মাছ পালাবে!'

বিশু চেয়ে দেখল এক বেজায় বুড়ো হাঁটু মুড়ে জলের ধারে রোদে বসে। তার হাতে একট ছোট ছিপ, পাশে সরু-মুখ চুপড়ি। তাতে একটাও মাছ নেই। বিশু বলল, 'তোমার পাথরে একটু রোদ্দুরে বসি ?'

বুড়ো ফোক্‌লা মুখে এক গাল হাসল, 'বস, বস, খুব খুসি হলাম। তাছাড়া পাথর-ও আমার নয়, রোদ-ও আমার নয়। কিন্তু নড়া-চড়া হট্টগোল কর না, তাহলে আমার মাছ পালাবে। অবিশ্যি মাছ-ও আমার নয়।'

বিশু রোদে পা গরম করতে আর বুড়োর মাছ ধরা দেখতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শীতে একটা আধ বিঘৎ মাছ গাঁথল। বুড়ো চটপট সেটি তুলে যত্ন করে বঁড়শী খুলে, মাছটাকে চুপড়িতে না ফেলে, জলে ফেলে দিল। বিশু দেখে অবাক। আবার মাছ পড়ল, আবার তাকে জলে ফেলা হল। জলে মাছ কিলবিল করছে।

এমনি করে সাতটা মাছ ফেলা হলে পর, বিশু জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'ছেড়েই যদি দেবে তো ধরছ কেন ?'

লোকটা অবাক হল। 'ছাড়ব না তো কি করব ?'

'কেন, চুপড়িতে রাখবে।'

'তাহলে তো মরে যাবে।'

'বাঃ, মরবে না ? জ্যান্ত তো আর খাওয়া হবে না।'

বুড়ো বঁড়শী গুটিয়ে বলল, 'আমি মাছ মাংস ডিম খাই না।'

'খাও না তো ধরছ কেন ?'

'মাছ ধরতে মজা লাগে তাও জান না ? চল, ওঠ।'

'কোথায় যাব ?'

'আমার ঘরে চল, কালো বেরি খাওয়াব।'

কালো বেরি বড় মিষ্টি। বিশু খালি চুপড়িটা হাতে নিয়ে তার ঘরে গেল। ঘর তো নয় ; আধখানা তার পাহাড়ের গায়ে পাথরের গুহা। তার সামনে গাছের গুঁড়ি বসিয়ে তিন দিকের দেয়াল হয়েছে, ছাদ হয়েছে, দেয়ালে তাক হয়েছে, সামনের অর্ধেকটা জুড়ে দরজা হয়েছে। ঘর রোদে ভরে গেছে।

তাকের সামনে জাল লাগিয়ে খাঁচা হয়েছে। খাঁচা ভরা ছোট বড় পাখি, সাদা লাল নীল সবুজ মেটে ছাই হলদে কালো। নাচছে, কুঁদছে, গান গাইছে। দেখে বিশু অবাক।

'কোথায় পেলে এদের ? আকাশের পাখিকে খাঁচায় পোরা নিষ্ঠুর কাজ।'

'কুড়িয়ে আনলাম। ডানা ভাঙা, ঠ্যাং খোঁড়া ! আকাশে এরা কেউ উড়তে পারে না। ছেড়ে দিলে কাগ প্যাঁচারা ঠুকরে খাবে !'

'ঐ বেজিটা কেন ? যদি পাখি ধরে ?'

'ওর তিনটে ঠ্যাং। কামড়ানো-ফাঁদে পড়েছিল। কোথায় যাবে ও ?'

'সাপ মারে আশা করি ?'

'কি জ্বালা ! বলছি সামনের একটা ঠ্যাং নেই, সাপ ধরবে কি করে ? কামড়ে দেবে না ? সাপের ভয়ে ও পাখির খাঁচার ছাদে চড়ে বসে।'

'তবে ঐ ধেড়ে কালো সাপ কেন ?'

'ও তো ধ্যানশ, ওর বিষ নেই। শিরদাঁড়া ভাঙা, চলতে পারে না। বাইরে বেরুলে শেয়ালে খাবে।'

'তাহলে শেয়ালটা রেখেছ কেন?'

'ও চোখে দেখে না; যাবেটা কোথায়?'

'ওরা কি খায়?'

'কি আবার খাবে, আমি যা খাই তাই খায়। বনের ফল-পাকুড়, শাঁকালু, মিঠে আলু, ছাগলের দুধ দিয়ে মকাই সেদ্ধ। আমার ছাগলকে বাইরে চরতে দেখনি?'

'গন্ধ পেয়েছি। কিন্তু এত সব পুষতে কিছু টাকা তো লাগে। কোথায় পাও?'

বুড়ো তখন তার বুনো ভুরুর তলা থেকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'জোগাড় করি।'

বিশু রাগ করে বলল, 'কেমন করে জোগাড় কর তা আমি জানি। বড় বাজারে তুমি আমার বাবার পকেট থেকে মাইনের সব টাকা তুলে নিয়েছিলে। বাবা তোমার নখ-ছ্যাচা-বুড়ো-আঙুল দেখেছিল, ভিড়ের মধ্যে আর কিছু দেখতে পায়নি। কিন্তু পুলিসরা বলছিল এ নাকি ঝানু চোর চানু বলে এক ছোকরার কাজ। সে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকে কেউ জানে না। আমাদের পূজোয় নতুন কাপড় হয়নি। গৌহাটিতে দিম্মার বাড়িতেও যাওয়া হবে না।'

বুড়ো বলল, 'কেন, তোমাদের অন্য কাপড় নেই?'

বিশু বিরক্ত হয়ে উঠল, 'তা নিশ্চয় আছে। সক্কলের থাকে।'

বুড়ো মাথা নাড়ল, 'আমার তো নেই।'

বিশু তখন সেই গন্ধওয়ালা বুড়োকে জাপ্টে ধরে বলল, 'কিনে নিও। ঐ টাকা থেকে গরম কোট পাজামা কিনো। আমি পুজোর

কাপড় চাই না, গৌহাটি যেতে চাই না। কিন্তু তুমি মরে গেলে, এদের কে দেখবে?'

বুড়ো হাসল। 'কেন, চান্নু দেখবে। সে রোজ রাতে এসে আমার ঘরদোর সাফ করে। সাপটার শীত লাগে, কারো গা ঘেঁষে না শুলে ও বাঁচবে না। তাই চান্নু ওর পাশে শোয়। সারাদিন খেটেখুটে রাতে এখানে এসে নিরাপদে থাকে। আর কালো বেরি খাবে না?'

বিশু উঠে পড়ে বলল, 'না, চলি। দেরি করলে মা আমাকে খুঁজতে ন্যাপাকে পাঠাবে। তুমি ভেবো না বুড়ো, আমি কাউকে কিছু বলব না। আবার আসব।'

—